বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৫২
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস, ২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

স্যর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এসসি., কে. টি.

শ্রীচরণেষু

এই ছোটো বইখানি আপনার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি।

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

কার্যকারণ-বাদ

পাঁচটি সহজবোধের শক্তি বা অনুভূতি নিয়েই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। মোটামুটি কাজ চালিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে এই বোধের সম্বলই তার যথেষ্ট। চারদিকে যা কিছু আছে তার সাধারণ খবর সে এই সহজবোধের ভিতর দিয়েই পায়, কিন্তু সে হল বাইরের খবর। ভিতরের খবর পেতে হলে শুধু বোধের শক্তিতে কুলবে না, জানার সীমানা বাড়ান দরকার; আবার জানার সীমা বাড়াতে হলে সঙ্গে সঙ্গে বোধের সীমাও বাড়াতে হবে। এই সহজবোধ ছাড়া আরো একটা সম্বল মানুষের আছে, সে হল তার বুদ্ধি; বোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নিগূঢ় হলে তবেই জানার সীমানা বাড়ান যায়। বিজ্ঞান ও দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিল অতীতের এক অন্ধকারময় যুগে যখন মানুষ সবেমাত্র পশুর কোঠা পেরিয়ে নূতন কতকগুলি মানস বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে শুরু করেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাকে, তার পূর্বপুরুষের জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এক অভিনব জীবনের ধারা নির্দিষ্ট করে দিল; এদের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য দুইটি—সবকিছুই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার স্পৃহা যার থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে দর্শন, আর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যাচাই করার আকাঙ্ক্ষা যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান।

আদিম যুগে যখন বোধ ও বুদ্ধির যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি তখন মানুষের নিকট প্রকৃতি ছিল রহস্যময় ও জটিল। ইন্দ্রিয়বোধের

নির্দিষ্ট সীমা ও তার সহজ প্রকৃতি দিয়ে দেখা এই জগতের একটা রূপ সে নিজের মনে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে; প্রকৃতির যে সব ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে তার কাছে বিশৃঙ্খল বলে মনে হত তাদের সে আরোপ করত একটা অনুকূল বা প্রতিকূল অতিমানবিক শক্তির খেয়ালের উপর। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে যে একটা কারণ আছে এই উপলব্ধি তখনও তার হয় নি। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যে তার সহজবোধকে সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, সহজের সীমানা ছাড়াতে তার সমস্ত বুদ্ধিকে জাগ্রত রেখেছে। ধীরে ধীরে সেই কঠিন সাধনায় সে অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্জ্ঞেয়কে করেছে সহজবোধ্য; সহজ অনুভূতির ভিতর দিয়ে পাওয়া এই জগতের অস্পষ্ট পরিচয়ে, এই আভাস ও ইশারায় তার মন সন্তুষ্ট হল না। এই অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে চলল তার অভিযান। যে আবরণ তার জানার সীমানাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বুদ্ধির আঘাতে তাকে মুক্ত করতে তার বহুযুগ কেটেছে; এই আবরণ যখন সরে গেল তখন সে দেখতে পেল যে এই জড়-জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কোন না কোন কারণ দিয়ে, আর একই কারণ ঠিক একই রকম ফল প্রদর্শন করে। জগতে কোন ঘটনাই বাইরের কোন অতিপ্রাকৃত প্রাণীর দ্বারা সংঘটিত হয় না, পূর্ববর্তী মুহূর্তের কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থাই তাকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার এই অবস্থাগুলি নির্ণীত হয় এদের পূর্ববর্তী কতকগুলি অবস্থা দিয়ে। এইভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল তার পরবর্তী সমগ্র ঘটনাবলীর ধারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়েছে সেই অবস্থা দিয়ে। একবার

এই প্রাথমিক অবস্থাগুলি নির্দেশ করতে পারলে বলা যায় যে এক অপরিবর্তনীয় পথে প্রকৃতি এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চলেছে। সংক্ষেপে বলা চলে, সৃষ্টি-ক্রিয়া শুধু জগৎ-সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ হয় নি, তার ভবিষ্যৎ ইতিহাসও সুনির্দিষ্টরূপে রচনা করে রেখে গেছে।

বহুযুগ ধরে মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে নিজের ইচ্ছায় সে প্রকৃতির ঘটনাবলীর ধারা পরিবর্তিত করতে সক্ষম। এই ধারণার মূলে তার কোন যুক্তি, বৈজ্ঞানিক মননশক্তি বা অভিজ্ঞতা ছিল না, শুধু তার সহজ প্রবৃত্তিই তাকে এই পথে চালিত করেছে। কার্যকারণ-সম্বন্ধের বোধ যখন থেকে তার মনে প্রতিষ্ঠিত হল তখন থেকেই ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে অতি-প্রাকৃত প্রাণীর সহায়তার কল্পনাকে সে ত্যাগ করতে দ্বিধা করল না। সপ্তদশ শতাব্দী, যাকে গ্যালিলিও ও নিউটনএর যুগ বলা চলে, তার সব চেয়ে বড় কীর্তি হল এই কার্য-কারণ-বাদকে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। আকাশের যে সব ঘটনাকে আগে ভৌতিক ঘটনা বলে মনে করা হত, দেখা গেল তাদের মূলে রয়েছে আলোকের ধর্ম; ধূমকেতুর আবির্ভাবে সাম্রাজ্যের পতন বা রাজার মৃত্যু সূচিত হয় বলে যে ধারণা এতকাল বদ্ধমূল ছিল, প্রমাণ হল যে তাদের আবির্ভাব বা অন্তর্ধানের মূলে রয়েছে মহাকর্ষের নিয়ম। কার্যকারণ-বাদে গভীর আস্থা ছিল বলেই নিউটন বলেছিলেন যে প্রকৃতির ঘটনাবলী সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যান্ত্রিক নিয়মে।

সমগ্র জড়বিশ্বকে একটা বিরাট যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করার এক প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত এর থেকেই হল; উনবিংশ

শতাব্দীর শেষভাগে এই আন্দোলনের বেগ চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছল। এই সময় জার্মান বিজ্ঞানী হেলম্‌হোলৎজ প্রচার করলেন যে প্রাকৃত বিজ্ঞানের চরম পরিণতি বলবিজ্ঞায় (Mechanics) বিভক্ত হওয়া; লর্ড কেলভিন বলেছেন যে যার কোন যান্ত্রিক মডেল গড়ে তোলা যায় না, তা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তখন এঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানীর যুগ, তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সমস্ত প্রকৃতির একটা যান্ত্রিক মডেল সৃষ্টি করা। ম্যাক্সওয়েল ওয়াটারস্টন ও আরো অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বায়বীয় পদার্থকে যন্ত্র-ধর্মী কল্পনা করে তার ধর্মগুলি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে এই যন্ত্র গঠিত হয়েছে অতি ক্ষুদ্র ও মসৃণ অসংখ্য গোলকের সমষ্টি দ্বারা; কঠিনতম ইস্পাতের চেয়েও এরা কঠিন, বন্দুকের গুলির মত দ্রুত এদের গতি। বায়বের চাপ সৃষ্টি হয় এদেরই সংঘাতে। এই ক্ষুদ্র গোলকগুলিকে বাহন করেই বায়বের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালিত হয়। তরল ও কঠিন পদার্থের ধর্ম এভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা আশানুরূপ সফল হলেন না; আলো ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রে তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। এই অকৃতার্থতাও তাঁদের সুদৃঢ় বিশ্বাসের মূলে আঘাত করল না, এই ধারণা তবুও তাঁদের বদ্ধমূল হয়ে রইল যে বিশ্বের ঘটনাবলী শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক নিয়মেরই অধীন।

একথা বলা হয়েছে, বহুযুগ ধরে মানুষের মনে এই ধারণা ছিল যে তার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তার জীবন-যাত্রার ধারা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয়, ইচ্ছামত সে এই ধারা পরিবর্তিত করতে পারে। কিন্তু কার্যকারণ-সম্বন্ধ যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যতই

যান্ত্রিক নিয়মের অন্তর্ভূক্ত হতে লাগল, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকার করা ততই কঠিন হয়ে উঠল। প্রকৃতির সর্বত্রই যদি কার্যকারণসম্বন্ধ বর্তমান থাকে তাহলে মানুষের জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? এইসব যুক্তি থেকেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর নিয়মিক (কার্যকারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত) সিদ্ধান্তের (Mechanistic Philosophy) সূত্রপাত হল; এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠল ভাব-দর্শন (Idealistic Philosophy)। সমস্ত জড়জগৎ একটা বিরাট যন্ত্র, নিয়মিক সিদ্ধান্তের এই মূল তথ্য বিজ্ঞান সমর্থন করল, কিন্তু ভাব-দর্শনের সমর্থকরা প্রচার করলেন যে মননশক্তি (Thought) থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জড়জগৎ। পরস্পরবিরোধী এই দুই মতবাদ প্রায় এক শতাব্দী ধরে মানুষের চিন্তাধারাকে বিভিন্ন পথে নিয়ে চলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভিনব আবিষ্কার হল—প্রাণশক্তির আধার যে-জীবকোষ, জড়পদার্থের মত তারও মূল উপাদান পরমাণু; প্রকৃতির যে-সব নিয়ম জড়ের পরমাণুকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, জৈব পরমাণুও সম্ভবত সে-সব নিয়মের অধীন। তখন একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিল, যে-সব বিশেষ শ্রেণীর পরমাণু থেকে মানুষের দেহ ও মস্তিষ্কের সৃষ্টি তারা কার্যকারণসম্বন্ধ মেনে চলবে না কেন। অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হল যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রাণশক্তির প্রকৃতিও যান্ত্রিক বলে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় এক যুগান্তর উপস্থিত হল। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা চলছিল সেইসব পদার্থ নিয়ে যেগুলি সোজাসুজি সহজবোধের শক্তিতে

ধরা দেয়, কিন্তু তাদের পরীক্ষাধীন ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাও কোটি কোটি অণুর সমষ্টি। অণুর সমষ্টি যে-বস্তুকণা ইন্দ্রিয়বোধে ধরা দেয় তার আচরণ নিঃসন্দেহে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন, কিন্তু তা বলে একথা জোর করে বলা চলে না যে একটিমাত্র অণুর ব্যবহারও এই নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ। এক বড় জনতার সমষ্টিগত ব্যবহার ও তার প্রত্যেকটি লোকের স্বতন্ত্র ব্যবহারে যেমন বিপুল পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বস্তুকণায় দলবাঁধা অণু ও তার প্রত্যেকটি অণুর আলাদা ব্যবহারেও ভেদ থাকা অসম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্বপ্রথম অণু, পরমাণু ও ইলেকট্রনের স্বতন্ত্র আচরণ পরীক্ষা করার পদ্ধতি জানা গেল, সঙ্গে সঙ্গে এ তথ্যও আবিষ্কার হল যে কতকগুলি ব্যাপারে, বিশেষ করে তেজ ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রে, কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এমন যন্ত্র তৈরি করা অসম্ভব যার সাহায্যে আলো ও মহাকর্ষ সৃষ্টি করা যায়।

কণিকাবাদ বা কোয়াণ্টাম থিয়োরির উত্থান ও নিয়তিবাদের (Determinism) পতন

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক পদার্থ ও বিকিরণের সাম্যস্থিতি (Equilibrium between Matter and Radiation) পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করলেন যে তেজবিকিরণ-প্রক্রিয়া ধারাবাহিক নয় (discontinuous), অতিক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন মাত্রায় (discrete units) পদার্থের তেজ শোষণ ও বিকিরণ ক্রিয়া ঘটে থাকে। এরই নাম দেওয়া হল কণিকাবাদ বা কোয়াণ্টাম থিয়োরি। কার্যকারণ-বাদকে মূলভিত্তি করে যে-বিজ্ঞান অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, প্লাঙ্কের এই নূতন মতবাদ তার মূলে আঘাত করল। উনবিংশ শতাব্দী

পর্যন্ত বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছিল যে কার্যকারণের নিরবচ্ছিন্ন ধারাতেই প্রকৃতির পথ একেবারে নির্দিষ্ট, কালের যাত্রায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই অপরিবর্তনীয় পথই প্রকৃতির একমাত্র পথ। কিন্তু এই অভিনব পরীক্ষার ধারা বেয়ে যে-নব্যবিজ্ঞানের সূচনা হল তাতে সব ক্ষেত্রে কার্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, বিশেষ করে পরমাণু ও আলোর আচরণে এই নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা গেল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

পদার্থমাত্রই অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য অণুকণার সমষ্টি। এই অণুকে ভাগ করে আরো ছোট কণা পাওয়া গেছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পরমাণু, ইওরোপীয় ভাষায় বলে 'অ্যাটম'। এই অ্যাটম নামধারীরাই জগতে অনেক দিন পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল পদার্থের ক্ষুদ্রতম মূল অংশ বলে, কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের গৌরব তারা বেশি দিন রাখতে পারলে না। পরীক্ষায় তাদেরও সূক্ষ্মতর ভাগ বেরিয়ে পড়ল, দেখা গেল পরমাণুর এই সূক্ষ্মতর অংশগুলি বৈদ্যুতকণা। এদের নাম দেওয়া হল ইলেকট্রন, এরা অতিক্ষুদ্র নিগেটিভ বৈদ্যুতকণা। এদের বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণাও বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে বেশি দিন আত্মগোপন করতে পারলে না; তাদের নাম হল প্রোটন, তারা পজিটিভ বৈদ্যুতকণা। ইলেকট্রন অত্যন্ত হালকা, কিন্তু প্রোটন তার চেয়ে প্রায় ২০০০ গুণ ভারি। এই বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণাগুলির বৈদ্যুতের পরিমাণ একেবারে সমান, তাই সাধারণ অবস্থায় প্রোটন-ইলেকট্রনে জোড়-বাঁধা পরমাণুর আচরণ বৈদ্যুতহীন কণার মত; প্রোটনের পজিটিভ বৈদ্যুতের প্রভাব ইলেকট্রনের সমমাত্রার নিগেটিভ বৈদ্যুতের প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন বিজ্ঞানের কার্যকারণসম্বন্ধ স্বীকার করলে নির্দিষ্ট আয়তন নিয়ে পরমাণু কখনও টিকে থাকতে পারে না, ভারি প্রোটনের আকর্ষণে

হয় ইলেকট্রন তার গায়ে গিয়ে পড়বে, আর তা না হলে ইলেকট্রনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে তাকে গতিশীল হতে হবে। অর্থাৎ কোন শক্তির প্রভাব ছাড়াই তার মধ্যে অবিরাম গতি সঞ্চারিত হবে; শক্তি ছাড়া গতি, কারণ ছাড়া কার্য, এ তথ্য বিজ্ঞান স্বীকার করে না। দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র পরমাণুর টিকে থাকার ব্যাপারটাই এ ক্ষেত্রে কার্যকারণসম্বন্ধের প্রতিকূল, অন্তত পরমাণুর আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় এই নিয়ম অচল।

ইংরেজ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডএর পরীক্ষায় স্থির হল ওজনের গুরুত্বে প্রোটন তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে পরমাণুর কেন্দ্রে, আর তাকে ঘিরে ঘুরছে ইলেকট্রনের দল। কোপেন্‌হেগেন্‌এর অধ্যাপক নীল বোর পরমাণুর অভ্যন্তরের ইলেকট্রন-প্রোটনের সাম্যস্থিতি ও আচরণ অনুধাবন করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রোটনকে কেন্দ্র করে বৃত্তপথে ইলেকট্রন তার চারদিকে ঘুরছে। প্রকাশলোকে দেখতে পাই সৌরজগতের মাঝখানে আছে সূর্য আর তার চারদিকে পাক খেতে খেতে ঘুরছে গ্রহের দল, তেমনি অপ্রকাশলোকের অন্তরে, পরমাণুর কেন্দ্রে, রয়েছে এক বা একাধিক প্রোটন আর তাকে বা তাদের মাঝে রেখে পাক খেতে খেতে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে ঘুরছে ইলেকট্রন বা ইলেকট্রনের দল। একটি প্রোটন শুধু একটিমাত্র ইলেকট্রনকে শাসনে রাখে; পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যে-পরিমাণ ঠিক সেই পরিমাণ ইলেকট্রনকে তারা আয়ত্তে রাখে। অনেকটা সৌরজগতের ছাঁদে গড়া বলে পরমাণুকে বলতে পারি অণুতম জগৎ। প্রত্যেকটি গ্রহ এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যপ্রদক্ষিণ করে, কিন্তু ইলেকট্রনের প্রদক্ষিণ-পথ একটি নয়, একাধিক। বাইরের কোন শক্তির তাড়নায় ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে স্থান পরিবর্তন

করে, আবার ফিরে আসে নির্দিষ্ট কক্ষে। কেন্দ্র থেকে এই কক্ষগুলির দূরত্ব নির্দিষ্ট, বাইরের পথ থেকে সে হঠাৎ দেখা দেয় ভিতরের পথে। তেজশোষণ করে ইলেকট্রন ভিতরের কক্ষ থেকে বাইরের কক্ষে লাফিয়ে যায়,এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর; ইলেকট্রন তখনই তেজ বিকীর্ণ করে যখন সে বাইরের কক্ষ থেকে ভিতরের কক্ষে ফিরে আসে। এই বিকীর্ণ তেজকেই আমরা পাই আলো রূপে। কক্ষচ্যুত ইলেকট্রনের লাফের মাত্রার উপর নির্ভর করে আলোর রঙ; বেগনী থেকে আরম্ভ করে লাল পর্যন্ত যে-সাতটা রঙ আমরা দেখতে পাই সেগুলি ইলেকট্রনমুক্ত তেজ ছাড়া আর কিছুই নয়, তেজের মাত্রাভেদে অনুভূতিতে জন্মায় রঙের ভেদ। ইলেকট্রনের লাফের মাত্রা খুব বেশি হলে তার থেকে পাওয়া যায় বেগনী-পারের আলো (আলট্রাভায়োলেট লাইট) আর খুব কম হলে পাই লাল-উজানী আলো (ইনফ্রারেড লাইট); দৃষ্টির বোধে এরা কেউ ধরা দেয় না। ইলেকট্রন যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তার তেজ বিকিরণ বন্ধ। সে যদি একটানা বৃত্তপথে চলতে থাকে তাহলে ম্যাক্সওয়েলএর বিদ্যুৎ-গতিবিদ্যা (Electro-dynamics) অনুসারে তার শক্তি হ্রাস হয়ে ক্রমশ চক্রপথ ছোটো করে সে কেন্দ্রবস্তুর উপরে গিয়ে পড়বে; পরমাণুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ হয়ে যাবে। কিন্তু পরমাণু তো টিকে রয়েছে। বোর অনুমান করেন কেন্দ্রের সব চেয়ে কাছের যে-পথ কোন ইলেকট্রন তা পেরিয়ে যেতে পারে না, ইলেকট্রন বাইরের পথ থেকে হঠাৎ ভিতরের পথে দেখা দেয়। কেন ও কখন যে ইলেকট্রন হঠাৎ বাইরের কক্ষ থেকে ভিতরের কক্ষে দেখা দেয়, কেনই বা একই কক্ষে চলতে থাকলে তেজ বিকিরণ করে না, তার কোন বাঁধা নিয়ম বা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না; তার এই অদ্ভুত আচরণ কার্যকারণ

সম্বন্ধের অতীত। এই মতটা ধরে নেওয়া একটা মত, এটা মেনে নিলে তবেই বুঝা যায় পরমাণু কেন টিকে আছে, বস্তুজগৎ কেন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

বিকিরণের ক্ষেত্রেও কার্যকারণসম্বন্ধের ব্যতিক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, এই নিয়মের অধীন হলে যে নির্দিষ্ট পরিণতি অবশ্যম্ভাবী, পরীক্ষায় তা পাওয়া গেল না। একটা সহজ উদাহরণ দিলে হয়ত কথাটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক কতকগুলি ইস্পাতের বলকে একটি ইস্পাতের মেঝেতে গড়িয়ে চালিয়ে দেওয়া হল। দুটি বলে যদি পরস্পর সংঘাত হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকটিরই গতি-বেগ ও গতির দিকের পরিবর্তন হবে, কিন্তু এই সংঘাতে তাদের সম্মিলিত গতিশক্তির (total energy) কোন পরিবর্তন ঘটবে না। হাওয়ার রোধশক্তি ও মেঝের ঘর্ষণজনিত রোধশক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বল দুটির গতিশক্তি হ্রাস হতে থাকবে, কিছুকাল পরে এই শক্তির সম্বল নিঃশেষ হলে তারা মেঝের উপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়াবে। বাইরে থেকে মনে হবে তাদের গতিশক্তি বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু আসলে এই গতিশক্তির বেশির ভাগই রূপান্তরিত হয়েছে তাপশক্তিতে। বলবিজ্ঞার সাহায্যে হিসেব কষে দেখান যায় যে এই ব্যাপার ঘটতে বাধ্য, বলগুলির সম্মিলিত গতিশক্তির অতি সামান্য অংশ ছাড়া বাকি সবটাই রূপান্তরিত হবে তাপশক্তিতে। এই জন্যেই কার্যকারণ-নিয়মে বাঁধা বিজ্ঞানে কোন যন্ত্রের অবিরাম গতির স্থান নেই। ঠিক এই ব্যাপারই বায়বের অণু সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কারণ বায়বের মধ্যে তার অণুগুলি সর্বদা চঞ্চল হয়ে ছুটাছুটি করছে, অবিরত তাদের পরস্পরের সংঘাত ঘটছে; কাজেই গতিশক্তি ক্রমশ হ্রাস হয়ে অণুগুলির একেবারে নিশ্চল অবস্থায় আসার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাই তাদের

গতিশক্তির এতটুকু ক্ষয় হয় না। দেখা যাচ্ছে বায়বের অণুর আচরণ বলবিজ্ঞার নিয়মের অধীন নয়। ইস্পাতের গোলক ও বায়বের অণু দুইই বস্তুকণা, কিন্তু তাদের ব্যবহার এতটা পৃথক হল কি করে। এর সহজ জবাব এই—যে-নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকণা বাঁধা, সহজবোধের অতীত যে অণু ও পরমাণু তারা ঠিক সেই নিয়মের অধীন নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক নূতন বিজ্ঞানের সূচনা হল; পরমাণবিক জগতে যে-সব ঘটনা ঘটছে এই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাদের এক নূতন ধারায় সুসম্বদ্ধ করা। জড়জগতের যে ঘটনাবলী কার্যকারণের নিয়মে সুনির্দিষ্ট করতে প্রবল বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল, এই বিজ্ঞান এক অভিনব পদ্ধতিতে সে-সব বাধাবিঘ্ন দূর করতে সচেষ্ট হল। নূতন বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টিপাত করলে তিনটি নির্দিষ্ট তথ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। প্রথমত দেখতে পাই ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্লাঙ্কএর আলোচনা; বিকিরণের ক্ষেত্রে যে-সব ঘটনাকে পূর্ববর্তী বলবিজ্ঞার নিয়ম সুসম্বদ্ধ করতে পারে নি, সেই নিয়মাবলীর পরিবর্তন এবং কেন যে পদার্থের শক্তি সম্পূর্ণরূপে তেজে রূপান্তরিত হয় না তার কারণ নির্দেশ করাই প্লাঙ্কএর আলোচনার উদ্দেশ্য। দেখা গেল এই পরিবর্তন সাধারণ সংস্কার নয়, আমূল পরিবর্তন; হয় প্রকৃতির ঘটনাবলীর অবিচ্ছিন্ন ধারা (continuity), না হয় কার্যকারণসম্বন্ধ, না হয় ঘটনাবলীকে দেশকালের পরিসীমায় পরিবর্তনরূপে নির্দেশ করার পদ্ধতি যে-কোন একটিকে বাতিল করে দিতে হবে। বস্তুত প্লাঙ্কএর পরীক্ষা থেকে মনে হয় যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে; চূড়ান্ত বিশ্লেষণে হয়তো প্রমাণ হবে যে বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিবর্তনের ধারা দেশকালে আবদ্ধ অবিরাম গতির সাহায্যে নির্দেশ করা চলবে না।

প্রাচীন বিজ্ঞানের মতে বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান হল জড়পদার্থ ও তেজ, জড়পদার্থ পরমাণুর সমষ্টি আর তেজ তরঙ্গসমষ্টি। কিন্তু প্ল্যাঙ্কএর মতে তেজ অতি ক্ষুদ্র তেজকণার সমষ্টি, পরমাণু যখন তেজ বিকিরণ করে বা শোষণ করে তখন এই তেজকণা পূর্ণ সংখ্যায় নির্গত হয় বা শোষিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করেন যে প্রত্যেকটি তেজকণা এক একটি অবিভাজ্য একক, দেশকালের সীমায় আবদ্ধ তার গতি; এই অবিভাজ্য তেজকণাকে তিনি "আলো-তীর" (Light-Arrow) নামে অভিহিত করেন। অনেক বিজ্ঞানীই এখন একে 'ফোটন' বলে থাকেন। আইনস্টাইনএর সিদ্ধান্ত মেনে নিলে তেজবিকিরণকে ফোটনের বর্ষণ (shower) বলে মনে করা যেতে পারে। তেজ যখন কোন বস্তুপদার্থের উপর পড়ে তখন এই তেজের ফোটনগুলি আলোর তীরের মত আঘাত করে তার বস্তুকণাকে, একটি মাত্র ফোটনের সঙ্গে একটিমাত্র ইলেকট্রনের সংঘাত হয়। যে আকর্ষণের শক্তিতে ইলেকট্রন পরমাণুতে বাঁধা আঘাতকারী ফোটনের শক্তি তাকে অতিক্রম করলে ইলেকট্রন পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পরীক্ষায় জানা গেছে যে আপতিত আলোর তীব্রতা হ্রাস করে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা একেবারে বন্ধ করা যায় না, অর্থাৎ ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারটা আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না, ফোটনের তেজমাত্রার উপর নির্ভর করে। আলোর তীব্রতা বাড়ালে কমালে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। এই পরীক্ষার ফল আইনস্টাইনএর সিদ্ধান্তের অনুকূল। মুক্ত ইলেকট্রন অর্থাৎ যে ইলেকট্রন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত নয় তা কখনও কোন ফোটনকে আত্মসাৎ করতে পারে না, ফলে দুটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) গোলকের মত ফোটন-ইলেকট্রনে একটা সংঘাত

হয়; এই সংঘাতে তাদের গতির দিক শুধু পরিবর্তিত হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কম্প্‌টন্‌ ও সাইমন্‌ ফোটন-ইলেকট্রন সংঘাতের পূর্বে ও পরে ইলেকট্রনের পথের আলোকচিত্র গ্রহণ করে প্রমাণ করলেন যে আইনস্টাইন-বর্ণিত ফোটন, কণিকাবাদ দ্বারা নির্ধারিত তেজমাত্রা ও ভরবেগের অধিকারী।

নূতন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তথ্য হল 'তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙবার মূল নিয়ম' (Fundamental Law of Radio-active Disintegration)। এই নিয়ম রাদারফোর্ড ও সডি নির্ধারিত করেন ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে। প্লাঙ্ক-এর কণিকাবাদ থেকে তেজস্ক্রিয়তার নিয়ম উদ্ভূত হয় নি, এদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্দেশ করেন আইন্‌স্টাইন আরও চোদ্দ বছর পরে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বেকরেল এবং মাদাম ও পিয়ার কুরি অস্বাভাবিক গুণসম্পন্ন কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন (Uranium, Radium, Thorium ইত্যাদি)। তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের সকলের চেয়ে চমক লাগল এই পদার্থগুলির অদ্ভুত স্বভাব দেখে। এরা নিজেদের মধ্যে থেকে জ্যোতিষ্কণা বিকিরণ করে নিজেদের নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসেতে এসে ঠেকে; এক মৌলিক পদার্থ থেকে যে অন্য মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে তা এই সর্বপ্রথম জানা গেল।

তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরমাণুর গঠনরীতি পরীক্ষায় জানা গেছে যে সাধারণ পদার্থের পরমাণুর মত তাদেরও অভ্যন্তরে রয়েছে এক কেন্দ্রবস্তু আর তারই চারদিকে বৃত্তপথে ঘুরছে ইলেকট্রনের দল। এই কেন্দ্রবস্তুতে প্রোটন-ন্যুট্রন জাতীয় নানাবিধ মূলকণা সংঘবদ্ধ হয়ে আছে। ন্যুট্রন পরমাণুরই একটি বৈদ্যুতহীন মূলকণা, প্রোটন থেকে সামান্য একটু ভারি। পরমাণুতে জুড়ি মিলেছে যে প্রোটন-ইলেকট্রন,

তাদের ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। সমধর্মী বৈদ্যুতদলের মধ্যে একটা স্বভাবগত বিরুদ্ধতা আছে, অর্থাৎ প্রোটন প্রোটনকে এবং ইলেকট্রন ইলেকট্রনকে এড়িয়ে চলে; এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে দুই বা ততোধিক প্রোটন, পরমাণুর বাইরে যাদের চিরবিরুদ্ধতা, কেন্দ্রের মধ্যে তারা কেমন করে, কোন্ শক্তির প্রভাবে এই বিরোধ মিটিয়ে পরমাণুর শান্তিরক্ষা করছে। অনেকে অনুমান করেন যে অত্যধিক কাছাকাছি এলে প্রোটনের দল পরস্পর দ্বন্দ্ব মিটিয়ে প্রবলতর এক আকর্ষণের টানে বাঁধা পড়ে। যে-সব পরমাণু হালকা তাদের কেন্দ্রবস্তুতে এদের মৈত্রী অটুট, কিন্তু অত্যন্ত ভারি যারা যাদের কেন্দ্রে প্রোটন-ন্যুট্রনের ভিড় জমেছে বেশি, যেমন ইউরেনিয়ম, রেডিয়ম বা থোরিয়ম, তাদের ভিতর এক দুর্নিবার প্রলয়কাণ্ড চলেছে। তারই আঘাতে এদের মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হালকা হয়ে এরা এক থেকে অন্যরূপ ধরছে; এরা সব বহুরূপীর দল। একটা কথা মনে রাখতে হবে, পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু যতক্ষণ অটুট থাকে ততক্ষণ দু-চারটে ইলেকট্রন বাইরের গণ্ডি থেকে লোকসান হলে তার মোট বৈদ্যুতের পরিমাণে কিছু কমতি পড়তে পারে, কিন্তু জাত বদলে যাওয়ার মত অপঘাত তাতে ঘটে না। কোন রকমে কেন্দ্রবস্তুতে ভাঙচুর আরম্ভ হলে তখনই তার রূপান্তর হয় অন্য মৌলিক পদার্থে।

সবচেয়ে ভারি পরমাণু হচ্ছে ইউরেনিয়ম ধাতুর; এর কেন্দ্রবস্তুতে আছে ৯২টা প্রোটন ও ১৪৬টা ন্যুট্রন। এই প্রোটন-ন্যুট্রন সংঘের ব্যবস্থানে এমন একটা কিছু ঘটে যার ফলে এর ভিতর থেকে ক্রমাগত জ্যোতিষ্কণা নির্গত হতে থাকে। কেন্দ্রের ভার কিছু কমলে সে রূপ নেয় রেডিয়মে, আরো কমলে হয় পলোনিয়ম, অবশেষে ঠেকে

সীসেতে এসে। এই লোকসানের পরেও সীসের কেন্দ্রবস্তুতে বাকি থাকে ৮২টা প্রোটন ও ১২৫টা ন্যুট্রন। আজও জানা যায় নি কী করে হঠাৎ কেন্দ্রবস্তুর প্রোটিন-ন্যুটন সংঘের ব্যবস্থানে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে কেন্দ্রবস্তু থেকে বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয় জ্যোতিষ্কণা। এই জ্যোতিষ্কণা তিন জাতের—আল্‌ফা-কণা (α-particles), বিটাকণা (β-particles) ও গামারশ্মি (γ-rays)। আল্‌ফা-কণা পজিটিভ বৈদ্যুতাশ্রিত হিলিয়ম গ্যাসের পরমাণু, বিটাকণা ইলেকট্রন, বিষম দ্রুত তার বেগ; আর গামারশ্মি, সে পরমাণু বা অতিপরমাণু নয়, প্রবল শক্তিশালী বিকিরণ, র‍্যণ্টগেন রশ্মির (Rontgen Rays) মতই স্থূলবস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে। কেন্দ্রবস্তুর বিস্ফোরণে যে হারে (rate) জ্যোতিষ্কণা নির্গত হয় তা সকল অবস্থাতেই সমান, পরীক্ষাগারের উর্ধ্বতম ও নিম্নতম কোন তাপমাত্রাতেই এর এতটুকু ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় নি। এক গ্র্যামের হাজার ভাগের এক ভাগ রেডিয়ম থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ কোটি পরমাণু ভাঙে, আর প্রত্যেকটি পরমাণু থেকেই তার বিশিষ্ট জ্যোতিষ্কণা নির্গত হয়। যতগুলি পরমাণু ভাঙে তাদের সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারে বা যে-সব জ্যোতিষ্কণা প্রক্ষিপ্ত হয় তাদের ধারা বদলাতে পারে আজও এমন কোন প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয় নি। এই বিস্ফোরণ স্বতোবৃত্ত (spontaneous); পরমাণুর অভ্যন্তরে এর মূল নিহিত, বাইরের কোন অবস্থাই এর মাত্রা ও রূপ এতটুকু পরিবর্তন করতে পারে না। এই হল তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্বতোবিস্ফোরণের মূল তথ্য।

এখন স্বভাবত এই প্রশ্ন উঠতে পারে কোন্ পরমাণুর প্রথম ভাঙবার পালা, আর এই বিস্ফোরণের মূল-কারণ কি। এসব পরমাণুর বর্তমান, অতীত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই তিনটির কোনটির উপরেই যদি

এদের ভাঙার কারণ নির্ভর করত তাহলে এসব অবস্থার পরিবর্তন-সাধনে এই বিস্ফোরণের হারও বদলান যেত ; কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে তেজস্ক্রিয়তার হার একেবারে সমান। ভারি মৌলিক পদার্থের বিস্ফোরণে যে-নূতন রেডিয়ম পরমাণুর সৃষ্টি হয় তার ভাঙার হার ও লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো রেডিয়ম পরমাণুর ভাঙার হারে এতটুকু ভেদ নেই। বয়সে প্রবীণ বলে কোন পরমাণু লোপ পাবে আর নবীন বলে সে বেঁচে থাকবে এমন কোন নির্দেশন তেজস্ক্রিয়াতে নেই। সামনে দাঁড় করিয়ে একদল সৈন্যের উপর বেপরোয়া গুলি চালালে যে অবস্থা ঘটবে পরমাণুর বিস্ফোরণের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম, নবীন প্রবীণে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে এ যেন ভাগ্যপরীক্ষার খেলা ; গুলির আঘাতে কখন কার জীবনের পরিসমাপ্তি হবে কেউ জানে না, বয়সের বিবেচনার কোন প্রশ্নই এক্ষেত্রে ওঠে না। বিজ্ঞানে ভাগ্যপরীক্ষার স্থান নেই, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারের কোন কারণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি বলে পরমাণুর বিস্ফোরণকে এক অদৃষ্ট কারণের (fate) হাতে ছেড়ে দিয়ে বলতে হয়, সেই পরমাণুই ভাঙে অদৃষ্টকারণের তাড়নায় যে ভাঙার সীমানায় এসে পৌঁছে।

নূতন বিজ্ঞানের তৃতীয় তথ্য প্রচার করলেন আইনস্টাইন ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ; পরমাণুর স্বতোবিস্ফোরণের ঘটনাকে তিনি প্ল্যাঙ্কএর কণিকাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই অভিনব তথ্য যে বিজ্ঞানের নিয়তিবাদের মূলে কী পরিমাণ আঘাত করেছে তা একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করা যাক। বিজলিবাতির সরু তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত করলে তারটা অতিমাত্রায় গরম হয়ে উঠে আলো ছড়িয়ে দেয়। এর মোটামুটি কারণ এই যে ডাইনামো (Dynamo) থেকে এই সরু তার বিদ্যুৎশক্তি গ্রহণ করে তাপ ও

আলো রূপে তা ছড়িয়ে দেয়। তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেকট্রন আপন আপন কক্ষপথে ঘুরছে, প্রতি মুহূর্তে বহু ইলেকট্রন হঠাৎ লাফিয়ে কক্ষবদল করছে ; এই প্রক্রিয়ায় কখনও তারা তেজ বিকীর্ণ করছে, কখনও বা তেজ শোষণ করছে। হিসেব কষে আইনস্টাইন দেখলেন তেজ ও উত্তাপের তাড়নায় যতগুলি ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয় তারা যে-তেজ মুক্ত করে দেয় তার পরিমাণ বিজলিবাতির সমগ্র তেজের পরিমাণের চেয়ে কম। এই ভেদ দেখে তিনি স্থির করলেন যে পরমাণু থেকে অন্য কোন উপায়ে আরও তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে, অর্থাৎ তেজ ও উত্তাপের তাড়না ছাড়া আপনা থেকেই কোন কোন ইলেকট্রন কক্ষ ত্যাগ করছে, রেডিয়ম পরমাণুর স্বতোবিস্ফোরণের মতই এসব ইলেকট্রনের ব্যবহার। সাধারণ বিজলিবাতির আলো থেকে আইনস্টাইন যে-অসাধারণ তথ্যের সন্ধান পেলেন তাতে বিজ্ঞানে নিয়তিবাদের পূর্ণ অবসান ঘটল।

তেজস্ক্রিয়তা বা আপনা থেকে ইলেকট্রনের কক্ষত্যাগ এই দুই ব্যাপারের মূল প্রকৃতির খানিকটা ধারণা মনে আনা সম্ভব হয় যদি পরমাণুকে আমরা এমন চারজন তাস খেলোয়াড়ের সঙ্গে তুলনা করি যারা প্রত্যেকেই একরঙা তেরখানা তাস হাতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করবেন। চার জনে মিলে গঠন করা এরূপ কোটি কোটি দল যে ঘরে খেলতে বসেছে তাকে খানিকটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে ধরে নেওয়া যাক। প্রত্যেকবার দলের মধ্যে তাস ভাগ করে দেবার আগে তাসগুলিকে যদি ভালো করে ওলটপালট করে দেওয়া যায় তাহলে একরঙা তাস পেয়ে যতগুলি দল খেলা বন্ধ করবে তাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হবে ঠিক তেজস্ক্রিয়তার মূল নিয়ম অনুসারে। তাসগুলিকে খুব ভালো করে ওলটপালট করে দিলে

কালমাত্রা ও অতীতের উপর খেলাভাঙার ব্যাপারটা মোটেই নির্ভর করবে না, কারণ তাস মিশিয়ে দেওয়াতে প্রত্যেকবারই নূতন অবস্থার উদ্ভব হবে। তাই যে হারে খেলোয়াড় দলের হ্রাস হবে তা অপরিবর্তনীয়, রেডিয়ম পরমাণু ভাঙার মতো। কিন্তু ওলটপালট না করে প্রত্যেকবার খেলা হওয়ার পর যদি তাসগুলি ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে কোন্ খেলোয়াড়ের হাতে কোন্ কোন্ তাস যাবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হবে ভাগ করার অব্যবহিত পূর্বে তাসগুলির যে ক্রমিক ব্যবস্থান ছিল তা দিয়ে; অর্থাৎ এই ব্যাপারটা কার্যকারণ নিয়মের অধীন হবে, যে-হারে খেলোয়াড়ের সংখ্যা এখন কমবে তা তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুভাঙার হার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তেজস্ক্রিয়তার নিয়ম অনুযায়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা হ্রাস করাতে হ'লে ক্রমাগত তাসগুলিকে ভালো করে ওলটপালট করে দিতে হবে। পরমাণুকে ভাঙনের গণ্ডীতে ঠেলে দিতে যে অজ্ঞাত কারণ এই ওলটপালটের ব্যবস্থা করে চলেছে তারই নাম দেওয়া যেতে পারে অদৃষ্টকারণ বা ভাগ্য (Fate)। ভাগ্য সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ না হ'লেও একথা বলা চলে যে কার্যকারণ সম্বন্ধের নিশ্চয়তাকে প্রশমিত করতে প্রকৃতির ভিতর একটা অজ্ঞাতপূর্ব কারণ বর্তমান। কেবলমাত্র অতীতের ব্যবস্থাতেই ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হবে একথা এখন আর জোর করে বলা চলে না, অন্তত আংশিক-ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ যে এক অজ্ঞাত ভাগ্যবিধাতার উপর নির্ভর করে তা মানতেই হবে।

একই রকমের কারণ একই রকমের ফল প্রদর্শন করে, প্রকৃতির এই সমতাই ছিল বিজ্ঞানের মূলতথ্য; কিন্তু এই নিশ্চিতবাদের যদি

পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে বিজ্ঞানের অস্তিত্বের কোন সার্থকতা নেই, তার সফলতারও কোন মূল্য নেই। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে এর সফলতা সন্দেহের অতীত, কাজেই তার মূল্যও স্বীকার করতে হবে। কণিকাবাদের অভ্যুত্থানে যে অনির্দেশ্যতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো তা পরমাণবিক জগতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্য এই যে অনির্দেশ্য ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম দিয়ে (statistical laws)। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের নির্দিষ্ট সীমানায় যে সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি ইলেকট্রন ও পরমাণু, পদার্থের মধ্যে এরা যেন ভিড় করে আছে ; কিন্তু এই ভিড় করা পরমাণু ও ইলেকট্রনের দল সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে বাঁধা, ফলে দাঁড়িয়েছে এই, এমন নিঁখুতভাবে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নির্দেশ করা যায় যে মনে হয় যেন প্রত্যেকটি পরমাণুর ভবিষ্যৎ গতি পূর্বেই আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল। ঠিক এভাবেই সংখ্যাতত্ত্ববিদ (statistician) কোন জাতির জন্মমৃত্যুর হার জেনে বলে দিতে পারেন ভবিষ্যতে ঐ জাতির লোকসংখ্যায় কতটা পরিবর্তন ঘটবে, যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পৃথক্‌ভাবে বলা তাঁর সাধ্যাতীত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ কার্য-কারণ নিয়মের অধীন, কেবলমাত্র পরমাণবিক জগতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায় ; যে মূল অঙ্গীকার বিজ্ঞানের ভিত্তি বহুক্ষেত্রে তার সার্থকতা এখনও রয়েছে, এই সার্থকতাই তার অস্তিত্বের মূল্য। নিয়তিবাদ কেন যে আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত, Descartes ও তাঁর অনুগামী দার্শনিকেরা কি ভাবে যে একে 'সহজ জ্ঞান' (*a priori* knowledge) বলে প্রচার করেছিলেন তা এখন বুঝতে পারা যায় ; প্রকৃতির যে-সীমায় তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি পৌঁছয়নি সেখানে নিয়তিবাদের হয়তো সমাধি ঘটতে পারে।

অনির্দেশ্যবাদ (Indeterminacy) ও বাস্তব (Reality)

নূতন বিজ্ঞানের যে-সব তথ্য আলোচনা করা হ'লো তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রকৃতিতে জড়বাদের (Materialism) মূল সুদৃঢ় করার চরম প্রয়াসই এর উদ্দেশ্য। চলা আর টানা, গতি আর সংযম এই দুই শক্তির ক্রিয়ায় জড়কণা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ, এই হ'লো জড়বাদের মূলভিত্তি। নব্য বিজ্ঞানে কোন কোন ক্ষেত্রে, সূক্ষ্মপরীক্ষার ফলাফল থেকে চলা-টানার মূলসূত্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে; শক্তির প্রভাবে জড়কণার ক্রমিক গতিপরিবর্তনের বদলে মেনে নিতে হয়েছে একটা অনির্দেশ্য ও হঠাৎ জেগে ওঠা গতি। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর স্বতোবিস্ফোরণ ও সাধারণ পরমাণুর আভ্যন্তরিক পরিবর্তনে কার্যকারণ সম্বন্ধের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না দেখে এক অনির্দিষ্ট ভাগ্যশক্তিকে মেনে নেওয়া হয়েছে; এই ভাগ্যই কতকগুলি পরমাণুকে ভাঙনের সীমায় ঠেলে নিয়ে যায়, আপন খেয়ালমতো বিশ্বপ্রকৃতিকে এক পথ থেকে অন্য পথে চালিত করে। পূর্বে যে-সব ঘটনার কোন কারণ নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি, নব্য-বিজ্ঞান এই অজ্ঞাত ভাগ্যের অবতারণা করে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বোধগম্য করেছে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে পূর্ণসফলতা লাভ করেছে একথা বলা চলে না। যেমন সব চেয়ে সরল বর্ণালীর (simplest spectrum), অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীর নিখুঁত ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু জটিলতর বর্ণালীর (more complex spectrum) পূর্ণব্যাখ্যা আজও সম্ভব হয়নি। নব্যবিজ্ঞানের বিরোধীদল একে পরিত্যাগ করার সপক্ষে বর্ণালীব্যাখ্যার অকৃতার্থতাই চরম যুক্তি

বলে প্রয়োগ করেননি; এর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো যুক্তি অনেকে দেখালেন যে প্রকৃতিতে ধারাবাহিকতা ও কার্যকারণ সম্বন্ধের উচ্ছেদ সাধন করে যতটুকু সফলতা লাভ হ'লো তাতে ত্যাগ করতে হ'লো বলবিদ্যার নিঁখুত নিয়মাবলী, কিন্তু মেনে নেওয়া হ'লো সংখ্যাতত্ত্বের কতকগুলি নিয়ম। প্রকৃতির মূল ব্যাপারে সেগুলি কেন যে প্রযোজ্য হবে তার কারণটাও দেখান হ'লো না।

নব্যবিজ্ঞানের সমর্থক যাঁরা তাঁরা বলেন যে এই ব্যাপারে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে পরিকল্পনায় প্রকৃতিকে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ ও কার্যকারণ নিয়মের অধীন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ বলে ধরে নেওয়া হয় তার সর্বত্র বলবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুলসিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হবে। দেশকালে সীমাবদ্ধ একটা অভিনব ঘটনাকে স্বীকার করে প্লাঙ্ক তাঁর কণিকাবাদের সাহায্যে এই ভুলসিদ্ধান্তগুলির সংশোধন করেন। এই সংশোধনের কাজে প্রয়োজন বোধে, কার্যকারণ সম্বন্ধ ও ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করলে আশ্চর্য হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই সাধারণ যুক্তি তখনকার দিনে অনেকেই স্বীকার করেন নি, কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কণিকাবাদের বিচ্ছিন্নধারা (discontinuity) ও অনির্দেশ্যতাকে প্রকৃতির চরম তথ্য বলে মেনে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের বহুবিভাগে কণিকাবাদের প্রয়োগ আরম্ভ হ'লো। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে এই নূতন মতবাদের সাহায্যে 'মৌলিক পদার্থসমূহের পর্যায়গত বিভাগ' (Periodic Classification of Elements) ও অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অবস্থিত পদার্থের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হ'লো। কিন্তু গোল বাধল

পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের চলাফেরা নিয়ে। আগেই বলা হয়েছে, অধ্যাপক বোর সিদ্ধান্ত করেন যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুকে ঘিরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বৃত্তপথে ঘুরছে, তেজ শোষণ করে ইলেকট্রন ভিতরের কক্ষ থেকে হঠাৎ লাফিয়ে বাইরের কক্ষে যায়, আবার সুবিধা পেলেই শোষিত তেজ বিকীর্ণ করে ভিতরের কক্ষে ফিরে আসে। যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তার তেজবিকিরণ বন্ধ। কি করে যে ইলেকট্রন বিকিরণহীন (radiationless) কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে হঠাৎ আবির্ভূত হয় তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল অর্থাৎ ইলেকট্রনের হঠাৎ কক্ষ বদল করার প্রক্রিয়াকে (transition process) একটা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন বলে কল্পনা করাও অসম্ভব হ'লো। পরিষ্কার বোঝা গেল গতিবিদ্যা ও তাড়িৎ-চুম্বকের নিয়মাবলী (dynamical laws and laws of electro-magnetism) পরমাণুর আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় অচল ; কণিকাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন নূতন নিয়মাবলীর সন্ধান করতে হবে যাদের সাহায্যে নব্য ও পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের অভিনব তথ্যগুলির একসঙ্গে মীমাংসা হয়। বোর ও তাঁর অনুগামী শিক্ষার্থীর দল একটা নূতন সূত্রের (Correspondence Principle) অবতারণা করে পরমাণবিক প্রক্রিয়ার মীমাংসার জন্যে কতকগুলি নিখুঁত নিয়মের কল্পনা করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল এগুলি সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম, ইলেকট্রনের কক্ষত্যাগের 'সম্ভাবনা' ছাড়া সঠিক কিছু নির্দেশ করে না। তেজের শোষণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়া এই সম্ভাবনার মূলে, এরূপ সিদ্ধান্ত ক'রে আইন্‌স্টাইন পদার্থ ও বিকিরণের সাম্যস্থিতি সমস্যার সমাধান করেন। প্রাচীন সংখ্যাতত্ত্ব পদ্ধতির (methods of classical statistics) প্রয়োজনীয়

পরিবর্তন সাধন করে বাংলার বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্লাঙ্ক-এর সূত্রে (Planck's Law) উপনীত হন। জার্মান বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ (Heisenberg) সর্বশেষে Matrix—বলবিজ্ঞা আবিষ্কার করে পরমাণু সম্বন্ধীয় সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধানের এক অভিনব সাধারণ পদ্ধতি গঠন করেন।

হাইসেনবার্গ-এর এই পদ্ধতির কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পরমাণুর বর্ণালী বিশ্লেষণে বোর-এর মতবাদ নিখুঁত নয়; তার কারণ বোর পরমাণুর এক অতি সরল রূপ কল্পনা করেছিলেন। পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের গতি দেশকালের সীমায় আবদ্ধ শুধু এই কল্পনা করেই বোর ক্ষান্ত হননি, অভ্যন্তরের ইলেকট্রন ও পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনের কোন ভেদ নেই বলেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও ইলেকট্রন আমাদের দৃষ্টিসীমায় ধরা দেয়নি, কেবলমাত্র তার চলার পথের খানিকটা অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রচণ্ড গতিশীল ইলেকট্রন যখন কোন বায়বের ভিতর দিয়ে তার অণুর ভিড় ঠেলে চলে তখন উইলসন-কক্ষে (Wilson-chamber) তার চলার পথটাই শুধু ফুটে ওঠে। আরও অনেক পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের চলার পথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য যোগাড় হয়েছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাই এই পরীক্ষাধীন ইলেকট্রন পরমাণুর বাইরের। পরমাণুর অভ্যন্তরের ইলেকট্রনকে পরীক্ষার সীমানায় আনবার সকল চেষ্টাই এপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই বাইরের ও ভিতরের ইলেকট্রনে যে মূলগত বা আচরণগত সাদৃশ্য আছে একথা অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কামারের হাতুড়ির আঘাতে তপ্ত লোহা থেকে স্ফুলিঙ্গ বাইরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত

হবে যে লোহার টুকরো স্ফুলিঙ্গের সমষ্টি, স্ফুলিঙ্গ ও লোহায় মূলগত কোন প্রভেদ নেই। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের (Theoretical Physics) সমস্যা সমাধানে বোর-নির্ধারিত পদ্ধতিই প্রমাণ-পদ্ধতি (standard method) বলে স্বীকৃত। কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনাকে সুসম্বদ্ধ করা যায় এমন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী আবিষ্কার করাই এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত, এই নিয়মগুলিকে গতি বা যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার জন্যে কতকগুলি ছবি বা মডেল কল্পনা করা, তৃতীয়ত, অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই মডেলের সাহায্যে নূতন ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণী করা। যেমন নিউটন এক মহাকর্ষের শক্তি অনুমান ক'রে মহাকর্ষের ব্যাপারের সমাধান করেছিলেন; তেজের বাহনরূপে এক ঈথরকে মাধ্যম (medium) কল্পনা করে আলোর চলা ও বিদ্যুৎ ও চুম্বকের আচরণ নির্ধারিত হয়েছিল। ইলেকট্রন হঠাৎ কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে লাফিয়ে যায় এই ব্যাপার বোর কল্পনা করেছিলেন পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এসব মডেলের সাহায্যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু নিখুঁত ভাবে অন্য ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়নি।

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন হাইসেনবার্গ এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে। তিনি সমস্ত মডেল, ছবি ও উপমা দিলেন বাতিল করে; যে নিশ্চিত জ্ঞান (sure knowledge) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় ও যে সংশয় (conjectural knowledge) মডেল ও উপমার ব্যবহারে জন্মায় তিনি তাদের সুস্পষ্ট প্রভেদ নির্ধারিত করেন। প্রকৃতিতে যে-সব ঘটনা ঘটছে আমাদের মন তাদের জানছে, এই জানার পিছনে রয়েছে মনের একটা ভূমিকা, তাই দার্শনিকদের অনেকে বলেন যে মন তিন অংশে বিভক্ত—একটা অংশ জন্মলব্ধ, দ্বিতীয় অংশ

ইন্দ্রিয়লব্ধ ও তৃতীয় অংশ প্রথম দুই অংশ থেকে চিন্তালব্ধ। মনের প্রসারতা বাড়ালেই মানুষ নূতন জ্ঞান লাভ করে; ভাবজগৎ, যার স্থান মনে এবং জড়জগৎ, যার স্থান মনের বাইরে, ইন্দ্রিয়বোধের এই দুই প্রান্তের জগতের সঙ্গে যখন কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখনই মানুষ নূতন জ্ঞানের অধিকারী হয়। নিখুঁত মাপজোখের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিজ্ঞান থেকে আমরা পাই নিশ্চিত জ্ঞান। যেমন বিজ্ঞানী যখন বলেন সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯.৩২ বা হাইড্রোজেন বর্ণালীর একটি বর্ণরেখার (spectrum line) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য '০০০০৬৫৬২৮ তখন প্রথম তথ্য দিয়ে তিনি এই নির্দেশ করেন যে এক টুকরো সোনার ওজন তার সম আয়তন জলের ওজনের চেয়ে ১৯.৩২ গুণ বেশী, আর দ্বিতীয় তথ্য থেকে এই বোঝায় যে হাইড্রোজেন পরমাণুর একটি বিশেষ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটরের '০০০০৬৫৬২৮ গুণ এই সেন্টিমিটর একটি নির্দিষ্ট একক যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই তথ্যগুলি আমাদের মনে নিশ্চিত জ্ঞানের সঞ্চার করে কারণ বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে এমন একটি অনুপাতের মানের (value of a ratio) সঙ্গে এই সংখ্যার কোন ভেদ নেই, আর এই সংখ্যা ও অনুপাতের ধারণা আমাদের মনে আগে থেকেই আছে। যে ভাষা আমরা বুঝতে পারি সেই ভাষায় এই তথ্যগুলি আমাদের দুটি নূতন খবর পৌঁছে দিয়েছে। নিশ্চিত-জ্ঞান শুধু সংখ্যার ভিতর দিয়েই পাওয়া যায় তাই হাইসেনবার্গ-এর আলোচনা গণিতশাস্ত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ; কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়ার মূল প্রকৃতি এর থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করার কাজেই হাইসেনবার্গ প্রথমত ব্যাপৃত ছিলেন; মৌলিক পদার্থের পরমাণু উত্তপ্ত করলে যে আলো

নির্গত হয় তাদের কম্পনসংখ্যার যে নিখুঁতমাপ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা করেছিলেন তাই ছিল তাঁর প্রধান সম্বল। অনেকেই এই কম্পন-সংখ্যাগুলির মধ্যে একটা বিশেষ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন; ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রিট্‌স্ (Ritz) দেখলেন এই কম্পনসংখ্যা (frequency) কতকগুলি মৌলিক কম্পনসংখ্যার অন্তর (difference)। এই মৌলিক কম্পনসংখ্যাগুলির আবার শ্রেণিবিভাগ আছে, যে কোন শ্রেণীর সংখ্যাগুলি ১, ২, ৩, ৪,......এই ক্রমিক পূর্ণসংখ্যাগুলির সঙ্গে জড়িত। বোর প্রমাণ করলেন বৃহত্তর পূর্ণসংখ্যার সঙ্গে যে কম্পনসংখ্যা যুক্ত প্রাচীন বলবিদ্যার সাহায্যে তার মান নিখুঁতভাবে হিসেব করা যায়; পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে ইলেকট্রন যদি খুব দূরে থাকে তাহলে প্রতি সেকেণ্ডে একটি সাধারণ ইলেকট্রন যতবার তার কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে এই কম্পনসংখ্যা ঠিক তার সমান। অর্থাৎ কেন্দ্রবস্তু থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ইলেকট্রনের আচরণ প্রাচীন বলবিদ্যার নিয়মে বাঁধা সাধারণ ইলেকট্রনের মত। যে সব ইলেকট্রন কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত তারা যে আলো বিকীর্ণ করে তাদের কম্পনসংখ্যা এই বলবিদ্যার সাহায্যে হিসেব করা চলে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম থেকে সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলির কক্ষপথ নিখুঁত ভাবে হিসেব করা যায়, কিন্তু নিকটতর গ্রহদ্বয় বুধ ও শুক্রের কক্ষপথ এই নিয়মের অধীন নয়। আপেক্ষিকবাদের (Theory of Relativity) সাহায্যে নিউটনের নিয়মের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে আইনস্টাইন এই প্রশ্নের সমাধান করেন। মহাকর্ষের এই নূতন নিয়ম হিসেব করতে তিনি একথা স্বীকার করে নেন যে সূর্য থেকে বহুদূরবর্তী স্থানেই কেবল নিউটনের নিয়ম প্রয়োগ করা চলে। হাইসেনবার্গও অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হয়ে এই তথ্য

মেনে নেন যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে বহুদূরবর্তী স্থানে প্রাচীন বলবিজ্ঞার নিয়ম প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের সঙ্গে কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রেই হাইসেনবার্গ-এর সিদ্ধান্তের যোগ; বস্তুকণার গতি দেশকালের পরিসীমায় আবদ্ধ এই তথ্যই ছিল প্রাচীন বলবিদ্যার মূলভিত্তি আর এর ভিতর দিয়েই দেশকাল, গতি ও বস্তুকণার সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ।

দেখা গেল পরমাণুর বহিঃসীমায় হাইসেনবার্গ-এর সিদ্ধান্ত এবং প্রাচীন বলবিদ্যা ও বোর-এর নূতন সিদ্ধান্তের কোন ভেদ নেই। পরমাণুর অভ্যন্তরে বোর ইলেকট্রনকে বৈদ্যুতকণা বলে মেনে নিয়ে বলবিদ্যার নিয়মাবলী সংশোধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু হাইসেনবার্গ অগ্রসর হলেন বিপরীত পথে. বলবিদ্যার ধারা বজায় রেখে তিনি ইলেকট্রনের পরিবর্তনে সচেষ্ট হলেন। বস্তুতঃ তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে ইলেকট্রন গেল বাদ পড়ে, কারণ ইলেকট্রন দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত বলে তার অস্তিত্ব শুধু অনুমানসাপেক্ষ। তাই হাইসেনবার্গ-এর নূতন সিদ্ধান্তে পরমাণু, কেন্দ্রবস্তু, প্রোটন, ইলেকট্রন বা কোনরূপ বৈদ্যুৎ কারও উল্লেখ নেই; এদের অস্তিত্ব অনুমান করতে হয় বলে কোন নিশ্চিত জ্ঞান এই অনুমান থেকে পাওয়া অসম্ভব। হাইসেনবার্গ-এর এই কণিকা-বলবিজ্ঞা (Quantum Mechanics) সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে, প্রাচীন বলবিজ্ঞা এর একটা অঙ্গমাত্র। প্রাচীন বলবিজ্ঞার সাহায্যে কোন সমস্তার সমাধান করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে রয়েছে ধারাবাহিক গতি ও পরিবর্তন, কিন্তু কণিকা-বলবিজ্ঞার প্রয়োগে যে সমাধান পাওয়া যায় তাতে থাকে ঝট্কানো গতি (jerky motion) ও এমন ধরনের পরিবর্তন যা হাইড্রোজেন বর্ণালীর ব্যাখ্যায় বোর অবতারণা করেন। প্রাচীন বলবিজ্ঞায় যদি

নির্ধারিত হয় একটি গোলক কোন আনত তলের (inclined plane) উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, কণিকা-বলবিদ্যায় তাহলে নির্ণীত হবে গোলকটি যেন লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। যে সব পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আমাদের বোধশক্তিতে ধরা পড়ে তাদের লাফের মাত্রা গতির তুলনায় এত কম যে বিচ্ছিন্ন লাফের পারম্পর্যকে অবিচ্ছিন্ন গতি থেকে পৃথক বলে মনে হয় না। এই ভাবেই কণিকাবাদের ঝট্‌কানো গতি, নিউটন-এর বলবিদ্যার ধারাবাহিক গতির সঙ্গে মিশে যায়।

প্রকৃতির যে-অংশ ইন্দ্রিয়বোধের অতীত তার থেকে যে সব খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় বিজ্ঞানের কাজ হ'লো তাদের সুসম্বদ্ধ করা। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম খবর গ্রহণ করতে ও মাপতে পারে তাহলে বাইরের জগতের একটা নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ আমাদের মনে জানা সম্ভব। ইন্দ্রিয়বোধের সীমা নির্দিষ্ট হলেও যন্ত্রের সাহায্যে এই সীমা অনেকখানি বাড়ান যায়; যেমন দূরবীন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিসীমা অনেকখানি বাড়ান হয়েছে। কণিকাবাদকে ভিত্তি করে যে নব্যবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার সাহায্যে হাইসেনবার্গ সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে একটা নির্দিষ্ট ভুলের সীমা অতিক্রম করা মানুষের অসাধ্য, যন্ত্র যত সূক্ষ্মই হোক তার মাপে এ ভুলটুকু থেকে যাবেই। এর কারণ ফোটনের আবির্ভাব যে খবর আমাদের এনে দেয় বাইরের জগৎ থেকে তার চেয়ে ছোট মাপের কোন খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না; এই ফোটন, অতি সূক্ষ্ম হ'লেও, পরিমিত তেজকণা, তাই তার সাহায্যে অপরিমিত সূক্ষ্ম মাপের খবর আশা করা যায় না।

বহুদিন থেকেই মানুষ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে এসেছে যে প্রকৃতির কাজের ধারা একেবারে নিখুঁত, যন্ত্রের কাজ এর তুলনায় সূক্ষ্মও নয়

নিখুঁত নয়। নব্য বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকে এ ধারণা বিজ্ঞানীদের বদ্ধমূল হয়েছে যে পরমাণুর আভ্যন্তরিক কর্মপদ্ধতিতে এই নিখুঁত ধারার সন্ধান পাওয়া যাবে; কিন্তু হাইসেনবার্গ-এর আলোচনা থেকে সেই ধারণার পূর্ণ সমাধি ঘটলো। কোন এক মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একই সঙ্গে জানতে পারলে সেই মুহূর্তে তার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায়; কোন নির্দিষ্ট শক্তির প্রভাবে এর ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হবে তাও সঙ্গে সঙ্গে স্থির করা যায়। বিশ্বের সমস্ত ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি জানতে পারলে তার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিও হিসেব করে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু হাইসেনবার্গ-এর আলোচনা থেকে প্রথম খবর পাওয়া গেল যে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একই সঙ্গে জানা অসম্ভব, কোন মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হলে সেই মুহূর্তে তার গতি ততটা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। প্রকৃতির ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট ভুলের গণ্ডী (margin of error) রয়েছে, এই গণ্ডীর ভিতরে প্রবেশ করে সূক্ষ্মতম মাপজোখের সন্ধান করলে তা ব্যর্থ হবে। আবার ইলেকট্রনের গতি নিশ্চিতরূপে জানলে তার স্থিতি সেই মুহূর্তে জানা যায় না। ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি যেন কোন ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের (magic lantern) স্লাইডের (slide) বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত; কোন খারাপ ল্যাণ্টার্ণের মধ্যে এই স্লাইড্ রাখলে তার দুই পৃষ্ঠের মাঝামাঝি অংশ পর্দার উপর কেন্দ্রীভূত (focus) করে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একসঙ্গে মোটামুটি দেখা সম্ভব। কিন্তু উৎকৃষ্ট ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে তা সম্ভব হবে না, যে পৃষ্ঠে স্থিতি অবস্থিত তা পরিষ্কার দেখতে হ'লে বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত গতি ঝাপসা হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞান এই খারাপ ল্যাণ্টার্ণের সঙ্গে তুলনীয়; এই বিজ্ঞান আমাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার

সৃষ্টি করেছিল যে সূক্ষ্মতম যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারলে তার সাহায্যে একই মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যাবে, এই ভ্রান্তিই বিজ্ঞানে নিয়তিবাদের প্রবর্তক। কিন্তু নব্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকে জানা গেল যে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি বাস্তবের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে (planes) অবস্থিত, যন্ত্র যত সূক্ষ্মই হোক তার সাহায্যে একটিকে জানলে অপরটি অনিশ্চিত থেকে যায়।

একই মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একসঙ্গে জানা কেন সম্ভব নয় তার একটা সাধারণ কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। কোন কিছুর সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘাত না ঘটলে তার অস্তিত্ব আমরা জানতেই পারি না, তার সম্বন্ধে কোন খবর পেতে হ'লে এই সংঘাতের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা চাই। কিন্তু কোন সংঘাতেই একটি ফোটনের চেয়ে কম মাত্রায় তেজ সংশ্লিষ্ট থাকে না; ইলেকট্রনকে পরীক্ষা করার মুহূর্তে ফোটনের আঘাতে তার অবস্থার এতটা পরিবর্তন ঘটে যে সংঘাতের মুহূর্তে তার যে-অবস্থা ছিল তার আসল খবরটা জানাই যায় না, শুধু পরিবর্তিত অবস্থার খবর যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। মনে করা যাক এমন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টি করা সম্ভব যার সাহায্যে ইলেকট্রনকে দৃষ্টিপথে আনা যায়। ইলেকট্রনকে দেখতে হ'লে তার উপর আলো ফেলতে হবে, এই আপতিত আলো ইলেকট্রন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যখন চোখে এসে পৌঁছবে তখনই ইলেকট্রনকে দেখতে পাওয়া যাবে। একটি ফোটনের চেয়ে কম মাত্রার তেজ ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত করতে পারে না, কিন্তু এই বিক্ষেপনের সময় ফোটন তাকে যে আঘাত দেয় তার পরিমাণ অনির্ণেয়। বিভিন্ন মাত্রার আঘাতের সম্ভাবনাই শুধু নির্দেশ করা চলে, নিশ্চিতরূপে এর মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না। কোন এক মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি নির্ণয় করতে গিয়ে তাকে অনিশ্চিতরূপে

স্থানচ্যুত করা হয় বলে সেই মুহূর্তে তার যে-ভরবেগ ছিল তার মাত্রা সঠিক নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভরবেগ নির্ণয়ে যতটুকু ভুল হবে তা নির্ভর করবে ফোটনের আঘাতের মাত্রার উপর, আঘাতের মাত্রা কম হলে ভুলের মাত্রাও কম হবে। আঘাতের শক্তি কমাতে হলে আঘাতকারী ফোটনের তেজমাত্রা কমাতে হবে, অর্থাৎ এমন আলো ব্যবহার করতে হবে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশী। কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গের আলো প্রয়োগ করলে অণুবীক্ষণের সূক্ষ্মতা কমে যাবে, তাই ইলেকট্রনের স্থিতি আর তেমন নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যাবে না। অণুবীক্ষণের সূক্ষ্মতা বাড়াতে হলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর প্রয়োজন কিন্তু এই আলোর তেজমাত্রা বেশী বলে ইলেকট্রনকে এত জোরে আঘাত করে যে তার ভরবেগ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ যেন উভয়-সংকট, একদিক সামলাতে গেলে অন্যদিকে বিপদ। এই বাধা-বিঘ্ন সাময়িক নয়, প্রকৃতিতে এমন একটা ব্যবস্থা রয়েছে যাতে পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একসঙ্গে জানার উপায় নেই। পরীক্ষা ও আলোচনার ধারা দেখে ইলেকট্রনের স্থিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ যাকে জানার উপায় নেই তার অস্তিত্ব মেনে নিতে আমাদের মন চায় না।

জড়ের উপাদান পদার্থ অনুসন্ধানের কাজ যতই অগ্রসর হতে লাগলো তার অভ্যন্তরে লুকনো মূল বস্তুকণার স্বরূপ ততই আয়ত্তাধীন হয়ে চললো; দৃষ্টিসীমার অতীত অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা—অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন পরপর আত্মপ্রকাশ করল। ইলেকট্রনই সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতকণা, পদার্থের চরম বিশ্লেষণে এর চেয়ে ছোট আর কোন মূলকণা আজও বের হয়নি। যে-বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে টেলিফোনে বার্তা প্রেরণ, বৈদ্যুতিক ঘন্টা চালানো, বা বিজলিবাতির আলো পাওয়া সম্ভব

হয়েছে তাদের মূলে রয়েছে বহুকোটি গতিশীল ইলেকট্রন। এই প্রবাহ যে শুধু কঠিন, তরল ও বায়বের মধ্য দিয়েই চলাচল করে তা নয়, বস্তুহীন শূন্য স্থানের মধ্য দিয়েও তার গতি অব্যাহত। এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যাতে প্রবাহসৃষ্টিকারী ইলেকট্রনের দল সমান্তরাল পথে একই গতিতে শূন্যের ভিতর দিয়ে চলতে থাকবে; এই অবস্থায় তাদের ইলেকট্রন-প্রবাহ না বলে ইলেকট্রন-বর্ষণ (electron-shower) বলাই সঙ্গত। এই বর্ষণের পথে কোন ধাতুর খুব পাতলা পাত রাখলে অন্তত কতকগুলি ইলেকট্রনের সঙ্গে এই ধাতুর পরমাণুগুলির কেন্দ্রবস্তু ও ইলেকট্রনের সংঘাত ঘটবে। এই সংঘাত হবে নানাদিক থেকে। তার ফলে বর্ষণসৃষ্টিকারী ইলেকট্রনের দল আপন গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে; ধাতুর পাত ভেদ করে বাইরে এলে তাদের মধ্যে আর সমান্তরাল পথে চলার শৃঙ্খলা বর্তমান থাকবে না।

কিন্তু পরীক্ষায় ফল হ'লো অন্যরূপ, ইলেকট্রনের দল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না হয়ে বিশেষ পথে দলবদ্ধ হয়ে নির্গত হ'লো। আমেরিকা-বাসী দুইজন বিজ্ঞানী, Davisson ও Germer, অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে এই তথ্যের সন্ধান পেলেন। কি নিয়মে ধাতুর পাত থেকে ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হয় তা খোঁজ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি নিকেল ধাতুর পাতের উপর সমান্তরাল পথে চালিত একদল ইলেকট্রন নিক্ষেপ করেন। সেই সময় এক দুর্ঘটনায় তাঁদের যন্ত্র ভেঙে যায়; যন্ত্রটিকে আবার কার্যোপযোগী করার সময় নিকেলের পাতটি অত্যধিক উষ্ণতায় দানাবাঁধা অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। দানাদার পদার্থের (crystals) কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে; এদের পরমাণুর সংস্থিতিতে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা বর্তমান। পরমাণুর বিন্যাসে কোথাও

ত্রিভুজ, কোথাও বর্গক্ষেত্র কোথাও বা ষড়ভুজাকৃতি সুষম জ্যামিতিক চিত্রের (regular geometrical figures) সৃষ্টি হয়েছে; দানাবাঁধা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লেগেছে। আলোর গুণ পরীক্ষা করতে সাধারণত Diffraction Grating নামে একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, বাংলায় একে পরিবেষ-নির্বাহক যন্ত্র বলা যেতে পারে। একটি ধাতুর ফলকের উপর সমান্তরাল অনেকগুলি দাগ কেটে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। দাগগুলি এত সূক্ষ্ম ও ঘনসন্নিবিষ্ট যে এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ দাগ থাকে। কোন আলো এই যন্ত্রের উপর থেকে প্রতিফলিত হলে বিভিন্ন রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। দাগগুলি যতই কাছাকাছি থাকবে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর পরীক্ষায় ততই এই যন্ত্র কার্যকরী হবে; পরীক্ষাধীন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় দুইটি পাশাপাশি দাগের ব্যবধান খুব বেশি হ'লে এই যন্ত্রের সাহায্যে ঐ আলোর বিশ্লেষণ চলবে না। পরীক্ষায় জানা গেছে লাল আলোতে এক ইঞ্চি স্থানে প্রায় ৩০,০০০ তরঙ্গ থাকে, বেগনী আলোতে থাকে প্রায় ৬০,০০০; এই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পরীক্ষা করতে হলে Grating-এর দাগগুলির যতটা সান্নিধ্য প্রয়োজন তার ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। কিন্তু র‍্যণ্টগেন-রশ্মিতে প্রতি ইঞ্চিতে কয়েক কোটি তরঙ্গ রয়েছে; এই রশ্মি বিশ্লেষণ করতে এমন Grating-এর প্রয়োজন যার দাগগুলির পরস্পর দূরত্ব পদার্থের পরমাণুর দূরত্বের সমান হবে। আজও এমন যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয় নি যার সাহায্যে এত কাছাকাছি দাগ কাটা যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লাওয়ে (Laue) সর্বপ্রথম এক পরীক্ষা করে দেখান যে যন্ত্রের সাহায্যে এত ঘনসন্নিবিষ্ট দাগ কাটার কোন প্রয়োজন নেই, প্রকৃতির ভাণ্ডারে দানাদার পদার্থের ভিতরেই তার পরমাণুর বিন্যাসে এরূপ Grating-এর ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে।

বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে পরমাণুর সুষম ব্যবস্থানে, দানাদার পদার্থের উপরিতলে, যে-সব অতি সূক্ষ্ম উঁচু নিচু স্থানের সৃষ্টি হয়েছে তারাই Grating-এর ন্যায়, এইজন্য র‍্যান্টগেন-রশ্মির মতো ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোকে বিশ্লিষ্ট করতে পারে। এই তথ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এক অভিনব ক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। কঠিন পদার্থ থেকে প্রতিফলিত র‍্যান্টগেন-রশ্মির আচরণ পরীক্ষা করে ব্রাগ ও ব্রাগ (W. H. Bragg & W.L. Bragg) ঐ পদার্থের পরমাণু-ব্যবস্থান সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু থেকে বিক্ষিপ্ত র‍্যান্টগেন-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নিখুঁত পরিমাপ নির্ধারণ করে সিগবান (Siegbahn) এসব পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্য সংগ্রহ করেন।

আলোকরশ্মির বিশ্লেষণে পরমাণুর ব্যবস্থানের প্রভাব আলোচনা করার পর, ডেভিসন-গর্মের পরীক্ষায় দানাদার নিকেল ফলক থেকে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের দল কেন যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট পথে দলবদ্ধ হয়ে নির্গত হয়, তা বোঝা কঠিন হবে না। নিকেল ফলকের উপরিতলে পরমাণুগুলি বিশেষ রকমে বিন্যস্ত হয়ে আছে বলে বর্ণসৃষ্টিকারী ইলেকট্রনগুলিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে-সব ইলেকট্রন তাঁরা পরীক্ষায় প্রয়োগ করেছিলেন তাদের গতিবেগ খুবই কম ছিল বলে এই পরীক্ষায় ইলেকট্রনের একটা নূতন প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত নিহিত ছিল তার যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত তাঁরা করতে পারেন নি।

কিছুকাল পরে জি.পি. টমসন (G.P. Thomson) উন্নততর পরীক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন ও অধিকতর দ্রুতগামী ইলেকট্রন ব্যবহার করে অনুরূপ পরীক্ষা সম্পন্ন করেন : যে-সব ধাতু স্বভাবতই দানাবাঁধা (যেমন সোনা)

তাদের সাহায্যে তিনি এত পাতলা পাত তৈরি করেন যে তার বেধ (thickness) ১০০টি পরমাণুর ব্যাসের সমষ্টির চেয়ে বেশী নয়; পাতগুলি এত সূক্ষ্ম যে প্রায় চোখে দেখা যায় না। বিনা বাধায় সেকেণ্ডে ৫০,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে এরূপ বেগবান ইলেকট্রন এই সূক্ষ্ম সোনার পাতের উপর ফেলে টমসন দেখলেন যে ইলেকট্রনের দল পাতের উপর থেকে প্রতিফলিত না হয়ে তাকে ভেদ করে চলে যায়। পাতের যে দিকে ইলেকট্রন আঘাত করছে তার বিপরীত দিকে একটি ফটোগ্রাফের প্লেট বসিয়ে তিনি পাত-ভেদকারী ইলেকট্রনগুলির পথের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এই চিত্রে পরপর কতকগুলি উজ্জ্বল ও কালো এককেন্দ্রীয় বৃত্তের আবির্ভাব দেখা গেল; সোনার পাত না থাকলে ইলেকট্রন-বর্ষণ প্লেটের গায়ে যেখানে এসে আঘাত করত তাকে কেন্দ্র করে এই বৃত্তগুলি ছড়িয়ে আছে। পরিষ্কার বোঝা গেল যে পাতের পরমাণু ইলেকট্রনের দলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না করে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করেছে। নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি এই পাত ভেদ করে গেলে যে রকম বৃত্ত সৃষ্টি করে, টমসন-এর পরীক্ষায় ইলেকট্রনের দলও অবিকল সেই রকমের বৃত্ত সৃষ্টি করেছে। পাতের পরমাণুর বিশেষ ব্যবস্থানের জন্যেই ইলেকট্রন নির্দিষ্ট পথে চালিত হয়েছে প্রথমতঃ এ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তাই যদি হ'ত তাহলে ইলেকট্রনের দল পরপর দুইটি পাত ভেদ করলে দ্বিগুণমাত্রায় বিক্ষিপ্ত হ'ত। পরীক্ষায় দেখা গেল দুইটি পাত ভেদ করলেও ইলেকট্রনের বিক্ষেপণের মাত্রার কোন পরিবর্তন ঘটে না, শুধু বৃত্তগুলির তীব্রতা হ্রাস পায়। এই পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ হ'লো যে ইলেকট্রনের নিজেরই এমন কোন গুণ বা বিশেষত্ব রয়েছে যা এই

বৃত্তসৃষ্টির মূলে ; ধাতুর পাতের পরমাণু এই বিশেষত্বকে প্রকাশিত করেছে।

র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির বিক্ষেপণে যে ধরনের চিত্র পাওয়া যায়, ইলেকট্রনের বিক্ষেপণেও প্রত্যেকক্ষেত্রেই ঠিক সেই ধরনের চিত্র পাওয়া যায় ; কাজেই একথা স্বীকার করতেই হবে যে ইলেকট্রন ও র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির ভিতর একটা মূলগত সাদৃশ্য রয়েছে, অর্থাৎ ইলেকট্রনের মধ্যেও তরঙ্গের ধর্ম নিহিত রয়েছে। বর্ষণসৃষ্টিকারী ইলেকট্রনের গতি কমালে এমন ধরনের চিত্র পাওয়া যায় যা অন্য এক নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের র‍্যাণ্টগেন-রশ্মির চিত্রের অনুরূপ। ইলেকট্রনের গতি কমালে, যে র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি এর সমতুল্য চিত্র সৃষ্টি করে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বাড়াতে হয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যও ইলেকট্রনের গতি বিপরীত আনুপাতিক (inversely proportional) ; তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ইলেকট্রনের গতিবেগ ও তার বস্তুমাত্রা (mass) এই তিনটি রাশির গুণফল একটি ধ্রুবরাশি (constant), যাকে বলা হয় প্লাঙ্ক-এর ধ্রুবরাশি (Planck's constant $= h = 6.55 \times 10^{-27}$)। এই ক্ষেত্রে প্লাঙ্ক-এর ধ্রুবরাশি 'h' এর আবির্ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল যে ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম ও কণিকাবাদ কোন না কোন উপায়ে পরস্পর সংযুক্ত। এ. জে. ডেম্‌ষ্টার (A. J. Dempster)-এর পরীক্ষায় জানা গেছে যে গতিশীল প্রোটনেরও ইলেকট্রনের ন্যায় তরঙ্গধর্ম বর্তমান। এসব পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত প্রমাণ হয় গতিশীল ইলেকট্রন প্রোটনের সঙ্গে যে তরঙ্গ যুক্ত আছে তা একেবারে কাল্পনিক নয়। যে চিত্র তাদের তরঙ্গধর্ম প্রকাশিত করেছে তার সাহায্যে পরমাণুর ভিতরে ও বাইরে, ইলেকট্রন-প্রোটনের আচরণ যতটা ভালো করে ব্যাখ্যা করা যায়, এদের কেবলমাত্র বৈদ্যুতাশ্রিত জড়কণা বলে কল্পনা করলে ততটা বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না।

ইলেকট্রন-প্রোটনের তরঙ্গের মত আচরণ পরীক্ষায় ধরা পড়ার পূর্বেই ডি-ব্রগলি কণিকাবাদের সাহায্যে এদের তরঙ্গধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন দেশকালের সীমায় আবদ্ধ যে-কোন বস্তুকণাকে কেন্দ্র করে তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। প্রাচীন বিজ্ঞানে বিকিরণের তরঙ্গধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায় নি, কিন্তু কণিকাবাদের সাহায্যে তার বিচ্ছিন্ন কণিকাধর্মের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে প্রোটন-ইলেকট্রনকে পূর্বে বৈদ্যুতাশ্রিত জড়কণা ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা হ'ত না, এখন দেখা গেল তাদের মধ্যেও তরঙ্গধর্ম বর্তমান। বস্তুকণা ও বিকিরণের দ্বৈত-ধর্ম (dual nature) প্রমাণিত হওয়ায় এদের মূল প্রকৃতি নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, একসঙ্গে পরস্পর-বিরোধী দুইটি ধর্ম কোন কিছুরই উপর আরোপ করলে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা মনে আনা দুঃসাধ্য। ইলেকট্রন-তরঙ্গকে (electron waves) কেন্দ্র করে তরঙ্গবলবিদ্যার (wave-mechanics) উদ্ভাবন করেন শ্রোডিঙ্গার (Schrodinger)। এই নূতন বলবিদ্যা জটিল গণিতশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর ধারা দেখে একবার আশা হয়েছিল যে বস্তুকণার সাধারণ ধারণা আমূল পরিবর্তন করে হয়ত প্রাচীন বিজ্ঞানের কার্যকারণ ও নিয়তিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। কিন্তু এর পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা গেছে এই ধারণা ভ্রান্ত; ইলেকট্রন-তরঙ্গ গণিতশাস্ত্রের গণ্ডিতেই আবদ্ধ, ফোটনের সাহায্যে যেমন আলোকের তরঙ্গধর্ম ব্যাখ্যা করা অসম্ভব তেমনি শ্রোডিঙ্গার-এর তরঙ্গের সাহায্যেও ইলেকট্রনের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। একমাত্র সংখ্যাতত্ত্বীয় ব্যাখ্যাতেই (statistical interpretation) শ্রোডিঙ্গার-এর গাণিতিক সমীকরণগুলির (equations) মূল অর্থ ধরা পড়ে।

ইলেকট্রন-তরঙ্গের আচরণ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এই তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের অনুরূপ। কণিকাবাদের সাহায্যে আলোক-তরঙ্গকে সম্ভাব্য-তরঙ্গ (waves of probability) বলে ব্যাখ্যা করা হয়, কোন বিন্দুতে তরঙ্গের তীব্রতা (intensity) ঐ বিন্দুতে ফোটনের আবির্ভাবের সম্ভাবনার পরিমাপ নির্দেশ করে। ইলেকট্রন-তরঙ্গেরও অনুরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব। মনে করা যাক জি. পি. টমসনের পরীক্ষায় বর্ষণ-সৃষ্টিকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে কেবলমাত্র একটি ইলেকট্রনে পৌঁছেছে। এই ইলেকট্রনটি ফটোগ্রাফের প্লেটের একটিমাত্র বিন্দুতে আঘাত করবে ; পূর্ববর্তী পরীক্ষায় প্লেটের যে স্থান কালো হয়েছিল এই বিন্দুটি তারই মধ্যে একটি বিন্দু, তা না হলে অনুমান করতে হবে কোটি কোটি ইলেকট্রন যা করতে পারে নি একটি মাত্র ইলেকট্রন তাই করেছে। যে বিন্দু অপেক্ষাকৃত বেশি কালো হয়েছে সেই বিন্দুতে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন আঘাত করেছে, তাই এই একটিমাত্র ইলেকট্রনেরও সেই বিন্দুতে আঘাত করার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। এই ভাবেই, আলোক-তরঙ্গের মতো, ইলেকট্রন-তরঙ্গকেও সম্ভাবনার তরঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করা যায় ; কোন এক বিন্দুতে এই তরঙ্গের তীব্রতা ঐ বিন্দুতে ইলেকট্রনের উপস্থিতির সম্ভাবনার পরিমাপ নির্দেশ করে। সম্ভাবনার তরঙ্গ বা সম্ভাব্য তরঙ্গ বলতে কি বোঝায় একটা উদাহরণ দিলে হয়ত সহজ হবে। জোয়ারের ঢেউ বলতে আমরা বুঝি জলের ঢেউ যা তার গতিপথের সব কিছুই সিক্ত করে দেয়, উত্তাপের ঢেউ বলতে বুঝি এমন একটা কিছু যা তার গতিপথের সবকিছুই তপ্ত করে দেয়। কিন্তু যখন কাগজে দেখি কোন বিশেষ স্থানে আত্মহত্যার ঢেউ লেগেছে, তার থেকে তখন একথা বোঝায় না যে ঐ স্থানের প্রত্যেকটি লোক

আত্মহত্যা করবে, শুধু এটুকু বুঝি যে তার আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা বেড়েছে। যদি কোন আত্মহত্যার ঢেউ কলকাতার উপর দিয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই কারণে কলকাতায় মৃত্যুর হার বেড়েছে; যদি বলা হয় আশ্চর্য দ্বীপের মতো কোন কাল্পনিক দ্বীপের উপর দিয়ে এই ঢেউ চলেছে, তাহলে বুঝব যে ঐ দ্বীপের প্রত্যেকটি অধিবাসীর আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা বেড়েছে। তরঙ্গ-বলবিদ্যায় ইলেকট্রন-তরঙ্গ বলতেও এই ধরনের একটা সম্ভাবনার ঢেউ বোঝায়।

হাইসেনবার্গ ও বোর মনে করেন ইলেকট্রন-তরঙ্গগুলি ইলেকট্রনের সম্ভবপর অবস্থা ও স্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কতকগুলি বিশেষ প্রতীক (symbol)। তাই যদি হয় তাহলে জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন হবে। ইলেকট্রন-তরঙ্গকে বাস্তব বলা চলে না, দেশকালের সীমায় এরা নির্দিষ্ট নয়, গাণিতিক সূত্রের মানস প্রত্যক্ষ (visualisation) ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই আমাদের হতে পারে না। বোর আবার একটা আশ্চর্য ধরনের সম্ভাবনার কথা বলেন—প্রকৃতির সূক্ষ্মতম ঘটনাবলী দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নয়; বৃহৎ পরিমাপের ঘটনাবলী ও বিকিরণ দেশকালের চতুর্মাত্রায় (four dimensions) সীমাবদ্ধ, অন্যান্য ঘটনাবলী এই সীমার বহির্ভূত। প্রকৃতির যে সব ঘটনা বহুমাত্রার (many dimensions) অন্তর্গত তাদের অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় সীমাবদ্ধ করতে গেলে তাদের ভিতর অনিশ্চয়তা প্রবেশ করে। মনে করা যাক এমন একদল প্রাণী আছে যাদের অনুভূতি পৃথিবীপৃষ্ঠের দুইমাত্রায় (two dimensions) সীমাবদ্ধ। ধরা যাক বৃষ্টি পড়ায় কোন কোন স্থান জলে ভিজে গেল। আমরা (যাদের অনুভূতি তিনমাত্রার অন্তর্গত) জানি, কোন্ জায়গা ভিজবে আর কোন্ জায়গা শুকনো থাকবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত

হবে তৃতীয় মাত্রার ঘটনাবলী দ্বারা। কিন্তু দুই মাত্রার প্রাণী, যাদের কাছে তৃতীয়মাত্রা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তারা যদি সমগ্র প্রকৃতিকে দুই মাত্রায় নিবদ্ধ করতে চায় তাহলে তারা শুষ্ক ও আর্দ্র অংশের সংস্থান নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে পারবে না। তারা শুধু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের শুষ্কতা ও আর্দ্রতার সম্ভাবনাই নির্দেশ করতে পারবে, আর এই সম্ভাবনাকেই তারা চরম সত্য বলে গ্রহণ করবে। কোন পদার্থ আলো ও দেয়ালের মাঝখানে রাখলে দেয়ালে তার একটা ছায়া পড়ে; এই ছায়া যেমন তিনমাত্রার অন্তর্ভূত বাস্তবের (three dimensional reality) দুই মাত্রায় অভিক্ষেপ (projection in two dimensions), তেমনি দেশকালে সীমাবদ্ধ ঘটনাবলী বহুমাত্রার অন্তর্ভূত বাস্তবের চতুর্মাত্রায় অভিক্ষেপ।

প্রকৃতির ঘটনাবলী থেকে যে সব জ্ঞান আমরা লাভ করি প্রাচীন বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোর বিভিন্ন পরীক্ষায় বস্তুকণা ও বিকিরণ যে পরস্পর-বিরোধী আচরণ প্রদর্শন করে, তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যে পরীক্ষা-ব্যবস্থায় নিখুঁতভাবে দেশ-কালের সীমায় স্থানাঙ্ক (space-time co-ordinates) নির্ণয় করা সম্ভব ঠিক সেই ব্যবস্থায় একই সঙ্গে তেজ ও ভরবেগের সম্বন্ধে (energy-momentum relations) নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। যখন পরীক্ষাব্যবস্থা এমন হয় যে স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের নির্ভুলতা চরমসীমায় পৌঁছে তখন তার থেকে যে সব ফলাফল পাওয়া যায় তাদের কণিকাধর্মের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়, আবার যে যন্ত্রের সাহায্যে তেজ ও ভরবেগ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় তার প্রয়োগে স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা যায় না। এই পরীক্ষার ফলাফল শুধু তরঙ্গের রূপকল্পনার (imagery of waves) সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা চলে।

প্রত্যেক মাপেরই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এই তথ্য স্বীকার করলে পরস্পর-বিরোধী এই সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। কোন পরীক্ষায়, পরীক্ষাধীন বস্তু ও পরীক্ষা করার যন্ত্র কে কতটা অংশ গ্রহণ করে তা কণিকাবাদের সাহায্যে সম্পূর্ণ পৃথক্ করার উপায় নেই, তাই পৃথক্ ক্ষেত্রে যে সব জ্ঞান লাভ হয় তাদের সংশ্লেষণে পরীক্ষাধীন বস্তুর এমন কোন সুস্পষ্ট রূপ কল্পনা করা যায় না যার সাহায্যে ঐ বস্তুর ভবিষ্যৎ আচরণ নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বোর-এর এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে পদার্থের মূল কণাগুলির আচরণ নির্দেশ করতে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম ছাড়া অন্য কোন নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হোক না কেন এই সাধারণ সিদ্ধান্তগুলির (general considerations) কোন পরিবর্তনই ঘটবে না।

বোর-এর সিদ্ধান্তের পরিণাম এই, যে-মূল সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে প্রকৃতির ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এতকাল ধরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে তাদের পরিত্যাগ করতে হবে; কার্যকারণবাদ ও বিশ্বজনীন (সার্বজনীন) নিয়মগুলি (universal laws) একসঙ্গে বাতিল করে দিতে হবে। বোর-এর সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। একদল বিজ্ঞানীর মতে কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য; প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলেই সব ক্ষেত্রে কার্যকারণবাদের প্রয়োগে সফলতা লাভ হয় না, তাই এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে ভিত্তি করে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসঙ্গত। যান্ত্রিক ব্যাখ্যার যুগের অবসান ঘটলেও এখন বিজ্ঞানীদের কর্তব্য, কার্যকারণবাদকে মূলভিত্তি করে বিজ্ঞানের অমীমাংসিত তথ্যগুলিকে নূতন নিয়মে সুসম্বদ্ধ করা। এঁদের বিরোধীদল নিয়তিবাদকে একটা অলৌকিক ধারণা

(inhuman conception) বলে মনে করেন; তার কারণ নিয়তিবাদ শুধু একটা অসম্ভব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয় নি, মানুষকে কার্যকারণের কঠিন সূত্রে আবদ্ধ করে ভাগ্যবিশ্বাসী ক্রীড়নক করে তুলেছে। তাঁরা বলেন নূতন মতবাদ বিজ্ঞানকে মানুষের উপযোগী করেছে; নিয়তিবাদে সংখ্যাতত্ত্বের ধারণা আমাদের বাস্তবের খুব কাছাকাছি নিয়ে চলেছে, একটা অসম্ভব আদর্শের পরিবর্তে এক গ্রহণযোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে। এই নূতন মতবাদ নব্যবিজ্ঞানে আশা ও প্রেরণা এনে দিয়েছে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করে প্রকৃতির রহস্য সম্যক্‌ উপলব্ধি করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে; যদিও এর সমস্ত ফলাফল মানুষের বোধগম্য নয়, তবুও যে সব প্রাথমিক কুসংস্কার মানুষের বুদ্ধিকে এত যুগ ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তারা দূরীভূত হবে। আমাদের যুক্তি ও দর্শন প্রকৃতির উপর আরোপ করা চলে না, বাস্তব থেকেই তাদের উদ্ভব আর বাস্তবের সঙ্গেই তারা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে।

উপসংহার

বিশ্বপ্রকৃতি নিজেকে একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে, তার দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিরহস্যকে গোপন করে বাইরের চেহারাটা এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যাতে মানুষ তার সহজবোধের কাঠামোর মধ্যে তাকে মোটামুটি ধরতে পারে। অতিবড়োকে অতিদূরে সরিয়ে দিয়ে তাকে করেছে ছোট, আর অতিছোটকে করেছে অদৃশ্য। সব কিছুই মানুষকে দেখিয়েছে, কিন্তু একটা অস্পষ্টতার আবরণ দিয়ে। সহজবোধে তার মূলপ্রকৃতির একটু আভাস ও ইশারা মাত্র পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের

উদ্দেশ্য হ'লো এই আবরণকে সরিয়ে প্রকৃতির মূলরহস্য অবারিত করা ; এই আবরণ ঘন কুয়াসার মতো, সহজদৃষ্টি বেশি দূর চলে না।

বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি কখনও কখনও এই পর্দা ভেদ করে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ; বিস্ময়কর রহস্যের তখন সন্ধান পাওয়া যায়, সমস্ত বিজ্ঞানের ধারায় একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে, জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি এক নূতন সূত্রে বাঁধা পড়ে। এই নূতন পরিবর্তনের অভিঘাতে কখনও বা মানুষের চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হয়ে নূতন পথে চালিত হয়। এই ধরনের ঘটনা বিরল হ'লেও কতকগুলি দৃষ্টান্ত সহজেই মনে আসে।

একদিন সহজ দৃষ্টিতে মানুষ দেখেছিল বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই জ্যোতিষ্কের দল ঘুরছে। কিন্তু যেদিন জানা গেল, বিশ্বের অগণিত নক্ষত্রদলের একটি অতি-সাধারণ নক্ষত্র সূর্যকে কেন্দ্র করে যে সব ক্ষুদ্র গ্রহের দল অবিরাম ঘুরছে পৃথিবী তাদেরই একটি, সেদিন তার চিন্তাধারায় এক বিপ্লবের সূচনা হ'লো। সেদিনও মানুষের চিন্তাধারা এমনি বিপর্যস্ত হয়েছিল যেদিন সে ডারউইনের জীবতত্ত্ব থেকে প্রথম জেনেছিল যে তার দেহ শুধু তারই জন্যে বিশেষ করে সৃষ্টি হয় নি, যে সব জীবজন্তু তার বহুপূর্বে পৃথিবীতে এসেছে তাদের দেহেরই ক্রমবিকাশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার বর্তমান দেহ। আবার নিউটন-এর বলবিদ্যা ও মহাকর্ষের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর মানুষের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হ'লো, সে বুঝতে পারলো যে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর জ্যোতিষ্কদলের কোন প্রভাব নেই, এরা কতকগুলি জড়পিণ্ড প্রকৃতির নিয়মাবলী মেনে নির্দিষ্ট পথে চলেছে। নিউটন্ এর পরিকল্পনা থেকে আরও একটা ধারণা তার বদ্ধমূল হ'লো যে জড়পদার্থমাত্রই, তা সে অতি ক্ষুদ্রই

হোক বা অতিবৃহৎই হোক, এই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। তাই সমস্ত পরিবর্তনও গতির মূল প্রকৃতি যান্ত্রিক বলে (mechanical in nature) অনুমান করা হ'লো. যন্ত্রের গতির মতো অতীত ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করে। জড় ও জৈব পদার্থ যদি একই নিয়মে পরিচালিত হয় তাহলে মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছা, যার বলে সে ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ করে ও জীবনযাত্রার আপন পথ বেছে নেয়, তা যাবে একেবারে নিরর্থক হয়ে। প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথই তার একমাত্র পথ।

কয়েক বছর হ'লো মানুষের চিন্তাধারায় আবার যুগান্তর এনেছে নব্য প্রাকৃত বিজ্ঞান; পদার্থবিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে অনেক দূর পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে অভিজ্ঞতা, মননশক্তি ও যুক্তির সাহায্যে এত যুগ ধরে বিশ্বজগতের যে-ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে নব্যবিজ্ঞানের এই আন্দোলনের ঢেউ তার ভিত্তিকেও প্রবল ভাবে আঘাত করছে। এককথায় বলতে গেলে দর্শনের (philosophy) উপরও এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের যোগ অচ্ছেদ্য, তাই বিজ্ঞানে কোন মূল পরিবর্তন ঘটলে দর্শনেরও যথাযোগ্য পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের ধারায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তা অনেকাংশে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত; প্রকৃতির রহস্য অবারিত করার চেষ্টায় দর্শনের যে-ভূমিকার উপর বিজ্ঞান নির্ভর করে এসেছে, নব্যবিজ্ঞানের পরীক্ষায় তা ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই পরিবর্তন দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে আমাদের জীবনযাত্রার দার্শনিক সমস্যার সমাধান আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ধারণার প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছে নব্যবিজ্ঞান। প্রথম বিষয় হ'লো কার্যকারণ-সম্বন্ধ,

যা দর্শনের একটা মূল তথ্য বলে স্বীকৃত, তা পরমাণবিক জগতে প্রয়োগ করা চলে না। কার্যকারণবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির মূলে প্রথম আঘাত করেন রাদারফোর্ড ও সডি তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিস্ফোরণের মূলসূত্র আবিষ্কার করে; পরমাণবিক জগৎ থেকে এর পূর্ণ নির্বাসন ঘটে যখন বোর (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে) ও আইন্‌স্টাইন (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) প্রমাণ করেন যে পরমাণু নিজে থেকেই হঠাৎ উচ্চতর তেজের অবস্থা থেকে নিম্নতর তেজের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণ ও পরমাণুর স্বতঃ অবস্থা পরিবর্তন এই দুটি ঘটনার কোন কারণ আজ পর্যন্তও নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি; মানুষের জ্ঞানের উন্নতির ইতিহাসে এরূপ অসম্ভব ঘটনার পরিচয় আর পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় বিষয়, যার সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল সংস্কার আবশ্যক, তা হ'লো একটা অন্ধবিশ্বাস যার উপর নির্ভর করে মানুষ ভেবেছিল যে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির চরম সত্তা (ultimate reality) একদিন উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। হাইসেনবার্গ-এর অনির্দেশ্যবাদ থেকে জানা গেল এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বোধের জগতের পিছনে রয়েছে যে-বাস্তব তাকে উপলব্ধি করতে যে ছবিই কল্পনা করা হোক না কেন তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিকিরণের কণাধর্ম ও পদার্থের তরঙ্গধর্ম এই দুই আবিষ্কার হাইসেনবার্গ-এর নূতন মতবাদের মূলভিত্তি। কেবলমাত্র বিকিরণের দ্বৈতধর্মই ছয়টি পরিণাম নির্দেশ করে: (১) ঘটনাবলীর বিচার করলে দেখা যায় প্রকৃতিতে সমতা লোপ পেয়েছে, (২) বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞানলাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, (৩) প্রকৃতির ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে দেশকালের সীমায় নির্দেশ করা চলে না, (৪) ভাবক (subject) ও ভাব্য (object) এদের ভেদ এখন

আর ততটা সুনির্দিষ্ট নয়, এই ভেদ ঘুচিয়ে তাদের সমন্বয় ঘটালে পূর্ণনির্দিষ্টতা (complete precision) ফিরে পাওয়া যায়, (৫) জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ-সম্বন্ধ নিরর্থক হয়েছে, (৬) এর পরেও যদি মনে করা হয় যে জগতের ঘটনাবলী কার্যকারণ-নিয়মের অধীন, তাহলে কল্পনা করে নিতে হবে এই ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জগতের এমন এক স্তরে যা আমাদের ঘটনাজগতের (world of phenomena) অতীত; সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। পদার্থের দ্বৈত-ধর্মও এই সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রকৃতিতে যদি কার্যকারণ-সম্বন্ধের স্থান না থাকে তাহলে যে-বিজ্ঞান প্রকৃতির সমতাকে মূলভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তার এত উন্নতি সম্ভব হ'লো কি করে। এর জবাব হ'লো এই যে, অনির্দেশ্যবাদ শুধু পরমাণুজগতের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় নিবদ্ধ, আর সেখানেও অনির্দেশ্য ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম-অনুসারে। কিন্তু সাধারণ বোধের জগতে, এমন কি অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না এমন ক্ষুদ্র বস্তুকণার জগতেও কার্যকারণ-বাদের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'লো পরমাণবিক জগতে ও বিকিরণের ক্ষেত্রে কার্যকারণ-সম্বন্ধের অভাব কি কোন স্বাধীন-ইচ্ছার সূচনা করে? এই প্রশ্নের জবাবটা কিছু গোলমেলে, তার কারণ এই যে, নব্যবিজ্ঞানে স্বাধীন-ইচ্ছার সংজ্ঞা এখনও নির্দিষ্ট হয় নি। পূর্ব-বর্তী বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হয়েছিল — বর্তমান অবস্থা দিয়ে যে-ঘটনা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট তার ভবিষ্যৎ অবস্থা মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও চেতনার সাহায্যে পরিবর্তিত হতে পারে কিনা, এই ছিল তার পরিষ্কার অর্থ। কিন্তু নব্যবিজ্ঞানে এই প্রশ্নের

ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অনির্দেশ্যবাদের বিধান অনুযায়ী দেখা যায় যে পরমাণবিক জগতে কোন ঘটনার ভবিষ্যৎ ধারা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত করতে গেলে তার বর্তমান অবস্থা যতটা নিশ্চিতরূপে জানা দরকার তা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বর্তমান অবস্থাই যার অনির্দিষ্ট, ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগে তার ভবিষ্যৎ ধারা পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না।

বর্তমানে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অনেকের মত এই যে নিয়তি-বাদের প্রতিপক্ষ বা বিকল্প (alternative) বলে কিছু নেই, চেতন জগতের অতীত (unconscious) একটা নিয়তি কোথাও আছেই। সমস্যা এই নয় যে আমাদের স্বাধীন-ইচ্ছা আছে কিনা, সমস্যা হ'লো আমরা কেন ভাবি যে আমরা স্বাধীন। যেমন আইনস্টাইন বলেন যে, চাঁদের স্বাধীন-ইচ্ছা ব'লে যদি কিছু থাকত তাহলে আপন কক্ষপথে নিরন্তর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সেই নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবার একটা ইচ্ছা একবার অন্তত তার মনে জাগত। তেমনি মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ধীশক্তি সম্পন্ন কোন প্রাণী যদি থাকে, আর অলক্ষ্যে বসে সে যদি মানুষের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে, তাহলে স্বাধীন-ইচ্ছার বলে কাজ করছে মানুষের এই ভ্রান্তধারণা দেখে সে মনে মনে হাসবে।

আজ মানুষের মন অভিভূত নব্য প্রাকৃত তত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। কতকগুলি জটিল সমস্যা এসে মানুষের চিন্তাধারাকে বিপর্যস্ত করছে—আমরা কি প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক মাত্র ; না আমরা স্বাধীন, আমাদের স্বাধীন-ইচ্ছাতে প্রকৃতির ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম ? জগতের মূলপ্রকৃতি জড় (material) না মানস (mental) ? না এই দুইয়ের সমন্বয় ? বস্তু ও মন এদের মধ্যে কোনটি প্রধান,

বস্তু থেকেই মনের সৃষ্টি না মন থেকেই বস্তুর সৃষ্টি? দেশকালের পরিসীমায় নিবদ্ধ আমাদের চেতনার জগতই কি চরম বাস্তব, না এই জগৎ কোন গভীরতর বাস্তবকে আবরণের মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে?

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ